IslamHouse.com

ইসলামের কিছু আলোচিত বিষয়ে অগ্রহণযোগ্য বিভ্রান্তি

সালেহ ইবন আব্দুল্লাহ ইবন হুমাইদ

ইসলামের কিছু আলোচিত বিষয়ে অগ্রহণযোগ্য বিভ্রান্তি: গ্রন্থটিতে ‘হোয়াইট ফাদার্স’ নামের খ্রিষ্টান মিশনারি সংস্থা কর্তৃক ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে উত্থাপিত কিছু প্রশ্নের জবাব দেওয়া হয়েছে। যেসব বিষয় নিয়ে আলোকপাত করা হয়েছে সেগুলো হচ্ছে: - সাম্য বা সমানাধিকার; -

স্বাধীনতা (ধর্মীয় স্বাধীনতা — দাসপ্রথা); - নারী; - শরী‘আত বাস্তবায়ন; - জিহাদ।

https://islamhouse.com/৩৮৪০২০

- ইসলামের কিছু আলোচিত বিষয়ে অগ্রহণযোগ্য বিভ্রান্তি
  - অতঃপর:
  - ভূমিকা:
  - সমানাধিকার
  - স্বাধীনতা
    - ভূমিকা: ফিকিরের (চিন্তার) স্বাধীনতা, কুফরের স্বাধীনতা নয়:
    - প্রকৃত স্বাধীনতা:

        - দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই:
        - রিদ্দাহ্ বা ধর্মত্যাগের বিধান:
    - দাসপ্রথা:
        - ইসলাম ও দাসপ্রথা:
        - দাস-দাসীর ব্যাপারে ইয়াহূদীদের অবস্থান:
        - দাস-দাসীর ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের অবস্থান:
        - আধুনিক ইউরোপ ও দাসপ্রথা:
    - নারী
        - উত্তরাধিকার (الميراث):
        - তালাক:

        - শিশুর অভিভাবকত্ব:
        - একাধিক স্ত্রী:
    - শরী‘আত বাস্তবায়ন
    - দণ্ডবিধি (হুদূদ) ও শারীরিক শাস্তিসমূহ:
    - আল্লাহর পথে জিহাদ (الجهاد في سبيل الله)
        - শর্ত:
        - জিহাদের হাকীকত:
        - পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও শর্ত:
    - গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি
    - স্বাধীনতা বিষয়ক প্রশ্নসমূহ:
    - সমতা বা সমানাধিকার বিষয়ক প্রশ্নসমূহ:

ইসলামরে কছিু আলোচতি বষিয়ে অগ্রহণযোগ্য বভি্রান্ত

শাইখ সালহে ইবন আবদুল্লাহ আল-হুমাইদ

অনুবাদ : ড. মো: আমনিুল ইসলাম

সম্পাদনা : ড. আবু বকর মুহাম্মাদ যাকারয়িা

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله و على آله و صحبه.

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর জন্য; আর সালাত ও সালাম শ্রষ্ঠে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামরে

প্রতি এবং শান্তি বর্ষিত হউক তাঁর পরিবার-পরিজন ও সাহাবীগণের প্রতি।

অতঃপর:

আমার নিকট পাশ্চাত্য রাষ্ট্রসমূহের একটি ইসলামিক সেন্টার থেকে কতগুলো প্রশ্ন এসে পৌঁছলো, যেগুলোর পেছনে উস্কানি দিয়েছে “আল-আবা আল-বীদ” তথা ‘হোয়াইট ফাদার্স’ নামক কট্টরপন্থী খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠন; আর যখন আমি এগুলোর ব্যাপারে জানতে পারলাম, তখন আমি সেগুলোর জওয়াব না দিয়ে পারলাম না।

আর প্রশ্নসমূহের ধরন-প্রকৃতি এবং যুবক ও অন্যান্যদের মাঝে ইসলামী দিক-নির্দেশনা যেভাবে চলছে সে প্রেক্ষাপটে উক্ত প্রশ্নমালার ছত্রে ছত্রে যা পাঠিত হচ্ছে তা বিবেচনা করে সে প্রশ্নগুলোর উত্তর দেওয়া ব্যতীত আমার গত্যন্তর ছিল না। তাছাড়া এ প্রশ্নগুলো ও অনুরূপ কিছু বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার পেছনে খৃষ্টান গির্জার যে সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য রয়েছে তা অস্পষ্ট নয়। এগুলো মূলতঃ এমন কিছু ধারাবাহিক পর্ব যা নিরবচ্ছিন্নভাবে পূর্ব থেকেই চলে আসছে তা ইতিহাসের প্রতিটি পাঠকই সহজে বুঝতে পারে। বিশেষ করে যারা খৃষ্টানদের বিভিন্ন আন্দোলন, তাদের

যাবতীয় প্রচেষ্টা সমন্বিতকরণ, সার্বিক পর্যায়ে তাদের আক্রমানাত্মক যাবতীয় পদ্ধতি সম্পর্কে ওয়াকফিহাল।

অতঃপর আমি এই ব্যাপারে মহান আরশের মালিক দয়াময় আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করছি; আল্লাহর দীনের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য, ইসলামের অনুসারীদের আত্মসম্মানের জন্য এবং আল্লাহ চায় তো ভাষা ও কলমের মাধ্যমে সংগ্রাম করার জন্য।

প্রশ্নসমূহে উপস্থাপিত ইস্যুগুলো নিম্নোক্ত প্রধান শিরোনাম অনুযায়ী লিপিবদ্ধ করা যায়:

— সাম্য বা সমানাধিকার;

— স্বাধীনতা (ধর্মীয় স্বাধীনতা — দাসপ্রথা);

— নারী;

— শরী‘আত বাস্তবায়ন;

— জিহাদ।

ভূমিকা:

১.

এই প্রশ্নগুলোর জন্ম বর্তমান সময়ে হয়নি; বরং এগুলো হল কতগুলো প্রশ্ন এবং সন্দেহ-সংশয়, যা ইসলামের উপর আঘাত হানার মতই পুরাতন।

আর যিনি এসব প্রশ্ন এবং অনুরূপ আরো যা কিছু এখানে বর্ণিত হয়েছে তার ব্যাপারে অবগত আছেন, তিনি জানেন যে, বিভিন্ন যুগে ও নানা উদ্দেশ্যে এসব প্রশ্ন প্রণয়নকারীগণ সেগুলোর জবাব পাওয়ার উদ্দেশ্যে তা করে নি এবং সত্যের অনুসন্ধান করাটাও তাদের লক্ষ্য ছিল না; বরং তারা সমাজের অভ্যন্তরে ও তার চিন্তা-গবেষণার ময়দানকে উত্তপ্ত করার উদ্দেশ্যে একটা বড় ধরনের শোরগোলের মধ্যে এসব প্রশ্ন ছুঁড়ে দিয়েছে। অতঃপর সেখান থেকে দ্রুত কেটে পড়েছে এবং তাদের আঙুলসমূহ তাদের কর্ণকুহরে ঢুকিয়ে দিয়েছে এ আশঙ্কায় যে, তারা এসব প্রশ্নের

সুষ্ঠু জবাব শ্রবণ করবে অথবা পেয়ে যাবে; সুতরাং মনে হচ্ছে তাদের উদ্দেশ্য হল প্রচণ্ড ভিড়ের ময়দানে কতগুলো টাইম বোমা নিক্ষেপ করা, অতঃপর তা বিস্ফোরিত হয়ে আক্রান্ত হওয়ার পূর্বেই দ্রুত সেখান থেকে পলায়ন করা।

২.

উভয় পক্ষের আলোচকদের নিকট স্বীকৃত বিষয়ের উপর ঐক্যবদ্ধ হওয়াটা কত সুন্দর হত, যাতে সেখান থেকেই আলোচনা শুরু করা যায় এবং সেখানেই ফিরে আসা যায়। কিন্তু এই গবেষকের অনুমান, এসব প্রশ্নের প্ররোচনার পিছনে উদ্দেশ্য হল

সন্দেহ ও সংশয়ের বীজ বপন করা; বরং ‘নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা’, ‘বর্ণ বৈষম্যের বিরোধিতা’, ‘সমানাধিকার’ ও ‘মানবাধিকার’ নিয়ে উচ্চবাচ্য— ইত্যাদির মত প্রশস্ত দাবি-দাওয়ার নামে অন্যদের উপর আক্রমণ করাই এ সব প্রশ্নের অবতারণার উদ্দেশ্য। আর আপনি ভালভাবেই জানেন যে, এই ‘তত্ত্ব’ তো অবাস্তব দাবি মাত্র, যা দুর্বল ও হীনমন্য শ্রেণির ব্যক্তিদের নিকট চকচকে, কিন্তু বাস্তবে পরীক্ষা করে দেখলে তা কেবলই মরীচিকা, যাকে পিপাসার্ত ব্যক্তি পানি মনে করে সেখানে যায় কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই পায় না; বরং পায় শুধু অহংকারী বড় কাউকে, যে নিগৃহীত ছোট কাউকে

আগলে রেখে পিঠে চাপড়ে দিচ্ছে যাতে করে তাকে তক্ষুণি খেয়ে ফেলতে পারে, অথবা তাকে রেখে দিচ্ছে যাতে শেষপর্যন্ত মোটাতাজা হলে খেতে পারে। এ তো ‘আইন’ ও ‘সভ্যতার’ সূক্ষ্ম খোলস পরানো মগের মুল্লুক, যা আধুনিক প্রযুক্তির অন্যতম অবদান!

৩.

আলাপ-আলোচনার সময় কতগুলো গ্রহণযোগ্য আদর্শ ঠিক করা দরকার, যা উদাহরণের ক্ষেত্রে সূত্র হিসেবে অনুসরণ করা যায় এবং লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করে তা অর্জনের জন্য চেষ্টা করা যায়।

আর যেহেতু এই প্রশ্নগুলো প্রকাশ পেয়েছে “হোয়াইট ফাদার্স” নামক খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠনের পক্ষ থেকে; তাহলে এই সংগঠনটি কি চাচ্ছে যে, খ্রিষ্টান নীতিমালাই হবে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় আদর্শ? আমি এ রকম ধারণা করি না; কেননা খ্রিষ্টান ও অ-খ্রিষ্টান সবাই খ্রিষ্টধর্মের ভেতরকার বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে ভাল করে জানে তাদের পবিত্র গ্রন্থের মাধ্যমে এবং অতীত ও বর্তমানকালের তাদের পোপ ও যাজকদের কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। আর আমার এই জবাবের মধ্যেই খ্রিষ্টানদের বিভিন্ন প্রকার

বিকৃতি ও বিচ্যুতির নমুনার দিকে দৃষ্টিপাত করা হতে পারে।

আর যদি ইয়াহুদী ধর্মই গ্রহণযোগ্য আদর্শ হয়, তবে খ্রিষ্টধর্ম ও এর পোপ, পণ্ডিত ও নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিবর্গের বাস্তবতা হল যে তারা ইয়াহুদী ধর্মকে বিকৃত ও অযোগ্য মনে করে।

আর যদি আদর্শ হয় আধুনিক পশ্চিমা সভ্যতা, তবে খ্রিষ্টান পোপ-ফাদার ও তাদের অনুসারীদের সেখানে কী কাজ? তারা যদি তাতে মুগ্ধ থাকে এবং তারা জনসাধারণের নিকট তা পেশ করতে এবং জনগণকে তার দিকে আহ্বান করে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে, তবে তা হবে

এক লজ্জাজনক বশ্যতা। কেননা, এ কথা সর্বজনবিদিত যে, এই সভ্যতার সমৃদ্ধির সুপরিচিত কারণগুলোর অন্যতম হচ্ছে গির্জা ও গির্জার যাজকদের বর্জন। এই সভ্যতা গির্জা থেকে এমনভাবে পলায়ন করেছে যে, তা পরবর্তীতে আর ফিরে আসবে না; তাদের ভাষায় ‘মধ্যযুগীয় পশ্চাদমুখিতা’য় যদি-না ফিরে যেতে ইচ্ছা করে!

তবে এখানে এই লেখক উক্ত পাশ্চাত্য সভ্যতাকে অনুকরণীয় হওয়ার মত উত্তম দেখে না। কারণ, তাতে রয়েছে প্রকাশ্য বিচ্যুতি ও মানবতার জন্য দুঃখ-দুর্দশা, যার কারণে গোটা বিশ্ব

ভয়-ভীতি, সন্ত্রাস, উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা ও অস্থিরতা অবরুদ্ধ হয়ে আছে যা অচিরেই যেন সে-সভ্যতা ও তার রূপকারদেরকে পরিপূর্ণ ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। আর তার মধ্যে এই বিচ্যুতি ব্যতীতও রয়েছে ‘মানবাধিকার’, ‘সমানাধিকারের’ মতো কিছু স্থূল তত্ত্ব, যেগুলোর কোনো বাস্তবতা নেই। আর এর বাস্তবতার কিছু যদি থেকেও থাকে, তবে তা শ্বেতাঙ্গ সাহেবদের জন্যই। তাদের ছাড়া অন্যদের জন্য শুধু রয়েছে জঙ্গলের শাসন কিংবা “উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে ভুলপন্থাও অনুমোদনযোগ্য” শীর্ষক বিকৃত তত্ত্ব ও আদর্শ।

দুঃখজনক হওয়া সত্ত্বেও এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সকলের নিকট সন্তোষজনক এমন কোনো জায়গা নেই, যেখান থেকে শুরু করে আমরা একটা সন্তোষজনক ফলাফলে পৌঁছুতে পারতাম।

৪.

উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর একটি জবাবও খ্রিষ্টধর্ম এবং খ্রিষ্টীয় আকিদা-বিশ্বাসে পাওয়া যাবে না। তবে একটি খ্রিষ্টান মিশনারি সংগঠন কী করে এসব প্রশ্ন উত্থাপন করে?

দাসপ্রথা, নারী সম্পর্কিত বিষয়াদি, পবিত্র ধর্মযুদ্ধ এবং খ্রিষ্টধর্ম

গ্রহণকারী ও অন্যান্যদের মধ্যে বিভক্তি— সবকিছুই খ্রিষ্টধর্মে বিদ্যমান; খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীরা এসব সমস্যার কি জবাব দেয়, তা জানার অধিকারও পাঠকদের রয়েছে।

যেহেতু এর জবাব না-বোধক, সেহেতু তারা কেন খ্রিষ্টধর্মের দিকে দাওয়াত দেয়া বন্ধ করে না? অথচ এ ধর্মতত্ত্বে এ সকল উত্থাপিত বিষয়াদি সমভাবে বিদ্যমান! মূলত তারা এই দিনগুলোতে এসব বিষয়কে উত্থাপন করছে দোষণীয় ও ত্রুটিপূর্ণ বিষয়রূপে, যাতে এর মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলিমদেরকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে হাসিল হতে পারে।

৫.

আরও একটি বিষয় অত্যন্ত পীড়াদায়ক ও তিক্ত। আর তা হল এই যে, এসব প্রশ্নের পাঠকমাত্রই অনুধাবন করতে পারবেন, এ প্রশ্নগুলো নিরপেক্ষ নয়। এসব প্রশ্নের বাক্যে ও ছত্রে প্রবৃত্তির অনুসরণ ও পূর্বপ্রসূত ধারনাই ছিল নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি।

৬.

উপরোক্ত কথাগুলো এই বিষয়ের ও উত্তরের অবতারণায় ভূমিকা হিসেবে আসায় আমি ব্যথিত। তা সত্ত্বেও প্রত্যেক অধ্যয়নকারীর জেনে রাখা প্রয়োজন এবং প্রত্যেক পর্যবেক্ষক

বিশ্বাস করতে পারেন যে, আমি সত্য অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে সর্বোচ্চ চেষ্টা-সাধনা করেছি। আর এ কাজটি করেছি আমি আল্লাহ তা‘আলার ভয়ে এবং তাঁর নিকট সওয়াব ও কল্যাণের আশায়; আমানত যথাযথভাবে আদায় করতে এবং গোটা মানবতার কল্যাণ কামনায়।

৭.

আর আমি সম্মানিত পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে, আমার এই জবাবের উদ্দেশ্য হল ঐসব অমুসলিমদের সম্বোধন করা, যারা কুরআন ও সুন্নাহর মত শরী‘আতের বক্তব্য দ্বারা পেশকৃত দলিলের প্রতি

অনুগত নয়। আর তাই এই প্রশ্নোত্তর ও আলোচনায় অন্য কোনো কিছুর চাইতে বিবেক-বুদ্ধিকে সম্বোধন এবং চিন্তাশক্তির সাথে আলোচনাই গুরুত্ব পেয়েছে।

তবে যেখানে প্রয়োজন হয়েছে সেখানে শরী‘আতের নস ও বক্তব্যসমূহও একত্রিত করা হয়েছে; পাঠক তা লক্ষ্য করে থাকবেন দাসপ্রথা ও অন্য কিছু বিষয়ের আলোচনাতে।

আর আমি পরিপূর্ণ আস্থা ও দৃঢ়তার সাথে বলতে চাই: নিশ্চয় আমার দীন হলো আল-ইসলাম; আর তার প্রতি আমার ঈমান ও বিশ্বাস নড়বড়ে হওয়ার মত নয়। আর আল-কুরআন

প্রকৃতভাবেই আল্লাহর বাণী; আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন সর্বশেষ নবী ও রাসূল এবং তিনি সকল মানুষের নিকট প্রেরিত আল্লাহর রাসূল। আর ইবরাহীম, মূসা ও ঈসা আলাইহিমুস সালাম হলেন আল্লাহর নবী ও বলিষ্ঠ রাসূলদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ তা‘আলা সকল জাতির মধ্যেই রাসূল প্রেরণ করেছেন; আর ইসলাম হল আল্লাহ তা‘আলার সর্বশেষ দীন, যা ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে তিনি গ্রহণ করেন না। আর আল্লাহ হলেন সাহায্য-সহযোগিতার আধার এবং তাঁর উপরই আমাদের ভরসা; মহান ও সর্বোচ্চ আল্লাহর সাহায্য ব্যতীত

কোন উপায় নেই এবং কোন শক্তি-ক্ষমতাও নেই।

এই পুস্তকে আমি প্রশ্নের ধারাবাহিকতায় কিছু পরিবর্তন করেছি এবং তা বিষয়বস্তুর আলোকে বিন্যাস করেছি; তাতে তার আসল ধারাবাহিকতা রক্ষা করিনি। তবে প্রশ্নকারকদের মূল ধারাবাহিকতায় প্রশ্নগুলো জবাবসমূহের শেষে উপস্থাপন করব।

* * *

সমানাধিকার

মানুষের মধ্যে সাম্য ও সমানাধিকার মানে সৃষ্টিগত ও চরিত্রগতভাবে একরকম ও সাদৃশ্যপূর্ণ হওয়া। সুতরাং

যখনই এই গুণাবলী একরকম হবে অথবা কাছাকাছি পর্যায়ের হবে, তখন সমতা ও সমানাধিকারের বিষয়টি যথার্থ ও কাছাকাছি পর্যায়ের হবে; আর যখন এই গুণাবলী ভিন্নিরকম হবে, তখন তার প্রভাবের মধ্যেও ভিন্নতা আবশ্যক হয়ে উঠবে।

আর এই প্রস্তাবনা বা ভূমিকাকে অবলম্বন করে বলা যায় যে, মানব সন্তানদের মধ্যে চূড়ান্ত সাম্য ও সমানাধিকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা একেবারেই অসম্ভব। তবে আমরা বলি যে, এই ক্ষেত্রে মূল বিষয় হল অধিকার ও দায়িত্ব-কর্তব্যের ক্ষেত্রে সমতা। আইন-কানুন ও বিধি-বিধান

অনুধাবন, আয়ত্তকরণ, বাস্তবায়ন, সাড়াদান এবং বিচার করার সক্ষমতাসম্পন্ন ন্যূনতম শারীরিক সক্ষমতা ও মানসিক যোগ্যতার সমতা সবার মধ্যে বিদ্যমান থাকার কারণেই তা সম্ভব। কিন্তু জেনে রাখা দরকার যে, মানব সৃষ্টির মূলেই মেধা ও চরিত্রের ব্যবধান রয়েছে। যার ফলে সৃষ্টি হয় কিছু স্বভাবগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবধান ও প্রতিবন্ধকতা, যেমনটি প্রশ্নে উত্থাপিত হয়েছে।

আর এসব প্রতিবন্ধকতার কিছু কিছু সাময়িক হতে পারে; আর কিছু স্থায়ী হতে পারে। আবার কিছু প্রতিবন্ধকতা রয়েছে যা কমই ঘটে থাকে; আবার কিছু

প্রতিবন্ধকতা প্রায়ই ঘটে। তবে প্রত্যেকে প্রতিবন্ধকতার প্রভাব তার নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই এই প্রতিবন্ধকতা অন্যান্য অধিকারের ক্ষেত্রে সমতাবিধানে বাধা হবে না।

চরিত্রের ক্ষেত্রে উত্তম চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি ও হীন চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তি সমান নয়; কিন্তু সে অন্য অধিকারের ক্ষেত্রে তার সমান হতে কোন বাধা নেই। বুদ্ধিমান ব্যক্তি আর নির্বোধ ব্যক্তি সমান নয়; আর নারী তার গুণাবলী, মেধা ও শক্তি-সামর্থ্যে পুরুষের মতো নয় (নারী বিষয়ে স্বতন্ত্র জায়গায় বিস্তারিত আলোচনা আসবে ইনশাআল্লাহ)।

এগুলো হল স্বভাবগত ও সৃষ্টিগত কিছু প্রতিবন্ধকতা।

আর সামাজিক প্রতিবন্ধকতা মানে হল, অভিজ্ঞতা ও জীবন অনুশীলনের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে যেসব প্রতিবন্ধকতার ব্যাপারে সমাজ একমত হয়েছে। মূলত এই ঐকমত্য সৃষ্টি হয় এসব গুণাবলীর পারস্পরিক ব্যবধানের বিষয়ে বুদ্ধিগত নিশ্চিন্তা ও পরিতুষ্টতা থেকে। এরূপ সামাজিক প্রতিবন্ধকতার দৃষ্টান্ত: জ্ঞানী ব্যক্তি ও মূর্খের মাঝে সমতা প্রদানে অস্বীকৃতি। কেননা, সকল মানুষ একমত যে, মূর্খ ব্যক্তি দায়-দায়িত্ব গ্রহণে নেতৃত্বের উপযুক্ত নয় এবং জাতির

সমস্যা সমাধান ও সমাজিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে তার উপর নির্ভর করা যায় না।

আর রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা হল রাজনৈতিক অথবা সামরিক কারণে শাসক ও প্রশাসক শ্রেণী কর্তৃক ঐক্যবদ্ধভাবে কোন কোন গোষ্ঠীকে রাষ্ট্রীয় কিছু গুরুদায়িত্ব প্রদানে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি। আর এই বিষয়টি কোন প্রকার বাকবিতণ্ডা ছাড়াই সকল জাতির মধ্যে স্বীকৃত।

এর দৃষ্টান্ত: ভিনদেশিকে রাষ্ট্রের প্রশাসনিক দায়িত্বগ্রহণ থেকে বিরত রাখা। সাধারণত এই প্রশাসনিক

দায়িত্ব ও চাকুরি সেই রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

অনুরূপভাবে নির্বাচনের অধিকার; কোন কোন পেশা গ্রহণ ও বিনিয়োগ নিষিদ্ধকরণ; সামরিক ও কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গের বিশেষ প্রটোকল ও বিধি-বিধান; তাদের ক্ষেত্রে বিদেশি নারী বিবাহে প্রতিবন্ধকতাসহ আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে।

আর এগুলোর মধ্যে আরও অন্তর্ভুক্ত: ইসলামী রাষ্ট্রের কোন কোন প্রশাসনিক পদে যিম্মীদের দায়িত্ব গ্রহণে বাধা প্রদান। আরও একটি উদাহরণ: মুসলিম নারীদের সাথে যিম্মীদের বিয়ে-শাদীতে বাধা দান। এই

প্রসঙ্গে আরও বিস্তারিত বিবরণ অচিরেই আসছে।

আর শেষে দুটি উদাহরণকে শর‘য়ী প্রতিবন্ধকতা হিসেবেও বিবেচ্য। কারণ, এই বিধানসমূহ ইসলামী শরী‘আতে স্বীকৃত। আর এগুলো যৌক্তিক বিষয় ও সঠিক সামাজিক প্রথা থেকে উৎসারিত, যেমনটি পাঠক অবলোকন করে থাকবেন।

এই হচ্ছে কিছু দৃষ্টান্ত, যার মাধ্যমে নিয়ম-নীতি বুঝতে পারা যায় এবং এই মর্মে তুষ্ট হওয়া যায় যে, মানুষের মাঝে চূড়ান্তভাবে সমতা বিধান করা অসম্ভব। বরং যদি সাধারণ সাম্যের কথা বলা হয়, তবে এর উপর ভিত্তি

করে এমন কতগুলো বিষয়ের উদ্ভব হবে যা সমাধান করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে না এবং তার ফলে মানুষের মেধার অবমুল্যায়ন অবশ্যম্ভাবী হবে এবং তাদের শক্তি-সামর্থ্যের অযথা খরচ হবে। এ কাজটি স্পষ্টত জঘন্য বিশৃঙ্খলা। এই শ্রেষ্ঠত্ব ও অধিকারই বিশ্বব্যবস্থাকে গঠন, সংস্কার, উন্নতি ও অগ্রগতির দিকে নিয়ে যায়। তা বাতিল করতে গেলে বিশ্বের শাসনব্যবস্থা নৈরাজ্যের দিকে চলে যাবে। আজকের এই দিনে সমাজতন্ত্রের পতনের যে করুণ অবস্থা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা বুদ্ধিমান ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন

ব্যক্তিদের জন্য দৃষ্টান্তমূলক প্রমাণ।

প্রকৃত বিষয়টি যদি এ রকমই হয়, তবে মেধার বিভিন্নতা এবং তাকে কাজে লাগানো ও তা থেকে উপকৃত হওয়ার পদ্ধতিতে তারতম্যের উপর ভিত্তি করে বস্তুগত তারতম্যের সৃষ্টি হয়; প্রত্যেকে মেধার অধিকারী তার মেধা অনুযায়ী সে বস্তুর উপযুক্ত হবে যা থেকে তার পরিবার ও সমাজ উপকৃত হবে। আর এ জন্যই বিভিন্ন বিভাগ ও দফতরের প্রধান, ব্যবস্থাপক ও তাদের নিম্নস্তরের ব্যক্তিবর্গের ক্ষেত্রে দায়িত্বের স্তর বিন্যস্ত করা হয়।

ইসলামী শরী'আত সুস্থ বিবেক-বুদ্ধির সাথে সংগতি রেখেই সেই সমতার দিকে আহ্বান করতে পারে না, যাতে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র, ব্যক্তিগত মেধাসমূহ এবং মানবসন্তানদের মাঝে বিদ্যমান পার্থক্যকে বাতিল করে দেয়। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে এ পার্থক্যের প্রভাব রয়েছে। আর এই শান্তি প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার সাধনই হল শরী'আতের চূড়ান্ত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

সুতরাং এটাই হচ্ছে সমতা প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী কার্যকর ও গুরুত্বপূর্ণ একটি কারণ।

অন্যদিকে জাতি, বর্ণ কিংবা ভাষার ভিত্তিতে পার্থক্যের কোন প্রভাব ইসলামী শরী‘আতে নেই। কিন্তু শরী‘আতে এই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ ধরনের পার্থক্য আল্লাহ তা‘আলার নিদর্শনসমূহের মধ্যে অন্যতম নিদর্শন যা তাঁর বড়ত্ব, শক্তির পরিপূর্ণতা এবং তাঁর ইবাদতের উপযুক্ততার উপর জ্বলন্ত প্রমাণ স্বরূপ।

আর এই প্রকারের ব্যবধানের আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ রয়েছে, যে দিকে ইসলাম ইঙ্গিত করেছে। আর তা হচ্ছে পারস্পরিক পরিচিতি ও আন্তরিক

বন্ধন সৃষ্টি। আল-কুরআনুল কারীমের বক্তব্য:

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقۡنَٰكُم مِّن ذَكَرٖ وَأُنثَىٰ وَجَعَلۡنَٰكُمۡ شُعُوبٗا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓاْ ...﴾ [سورة الحجرات: ١٣]

"হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার।" — (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

এ বিষয়টিকে দ্বীনে ইসলামের যা দ্বারা জোর দেওয়া যায় তা হচ্ছে, মুসলিমদের নিকট এটি স্বীকৃত বিষয় যে, আল্লাহ তা'আলা সব জাতির উপরে কোনো

জাতিকে মর্যাদা দিয়ে সৃষ্টি করেন নি, আর তিনি কোনো কওমের উপর অন্য কওমকে শ্রেষ্ঠত্বও দেন নি। আল্লাহ তা‘আলা এবং জনগণের নিকট মানুষের মূল্যায়ন হবে তার উত্তম আচরণ, সৎ আমল এবং আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর নির্দেশ অনুসরণের ক্ষেত্রে যথাযথ চেষ্টা-সাধনার দ্বারা। শরী‘আতের পরিভাষায় এর নাম ‘তাকওয়া’ বা আল্লাহভীতি। আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿ إِنَّ أَكۡرَمَكُمۡ عِندَ ٱللَّهِ أَتۡقَىٰكُمۡۚ ﴾ [سورة الحجرات: ١٣]

“তোমাদের মধ্যে আল্লাহর নিকট সে ব্যক্তিই অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে

তোমাদের মধ্যে অধিক মুত্তাকী।” — (সূরা আল-হুজুরাত: ১৩)

আর ইসলামের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মানুষের মর্যাদার মাপকাঠি হিসেবে) এই নীতিরই পুনরাবৃত্তি করেছেন তাঁর বক্তব্যের দ্বারা:

« يا أيها الناس! إن ربكم واحد، وإن أباكم واحد، كلكم لآدم و آدم من تراب، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، و ليس لعربي على أعجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأحمر على أبيض ولا أبيض على أحمرفضل إلا بالتقوى ...» (أخرجه أحمد و الترمذي عن أبي نضرة و قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح).

“হে মানুষ সকল! নিশ্চয় তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক, তোমরা সকলেই এক আদমের সন্তান, আর আদম মাটি থেকে তৈরি। নিশ্চয়ই তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সবচেয়ে বেশি সম্মানিত, যিনি আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্য থেকে সবচেয়ে বেশি তাকওয়ার অধিকারী। অনারবের উপর আরবের, আরবের উপর অনারবের, সাদার উপর লালের এবং লালের উপর সাদার তাকওয়া ব্যতীত অন্য কোন মর্যাদা নেই ...” — (হাদিসটি ইমাম আহমদ ও তিরমিযী আবূ নযর থেকে বর্ণনা করেন; হাইসামী বলেন: তার বর্ণনাকারীগণ সহীহের বর্ণনাকারী)।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল:

« أي الناس أحب إلى الله؟ قال: « أنفع الناس للناس» (أخرجه التبراني و غيره بألفاظ متقاربة، و هذا لفظ التبراني من حديث ابن عمر).

“কোন মানুষ আল্লাহর সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বললেন: মানুষের মধ্যে যে মানুষ অন্য মানুষের সবচেয়ে বেশি উপকারকারী।” — (হাদিসটি তাবারানী বর্ণনা করেন এবং অন্যরাও কাছাকাছি শব্দে বর্ণনা করেছেন। এখানে এটি ইবনু ওমর রা. এর হাদিস, যা তাবারানীর শব্দে বর্ণিত)।[১]

*****

স্বাধীনতা

এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হবে:

১. দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই।

২. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের ধর্মীয় স্বাধীনতা।

৩. রিদ্দাহ্ বা ধর্মত্যাগের বিধান।

৪. দাসপ্রথা।

ভূমিকা: ফিকিরের (চিন্তার) স্বাধীনতা, কুফরের স্বাধীনতা নয়:

স্বাধীনতা বিষয়ক প্রশ্নটিতে যে বক্তব্য এসেছে, তা হল: “কিভাবে সমন্বয় সাধন সম্ভব এ দুটি বিষয়ের মধ্যে যে, আল্লাহ মানুষকে যে চিন্তা ও বিশ্বাসের স্বাধীনতা দিয়েছেন এবং ...” (শেষ পর্যন্ত)[২]।

আর বলি: চিন্তার স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ইসলামে স্বীকৃত। আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে শ্রবণ, দৃষ্টি ও হৃদয়ের অনুভূতির মতো ইন্দ্রিয় দান করেছেন; যাতে তারা চিন্তা-ভাবনা ও অনুধাবন করতে পারে এবং পৌঁছুতে পারে সঠিক সিদ্ধান্তে। সুস্থ ও ঐকান্তিক চিন্তা-ভাবনার ব্যাপারে তাকে জবাবদিহি করতে হবে এবং তার

ইন্দ্রিয়ের অযত্ন ও অবহেলার জন্যও সে নিজেই দায়ী। তেমনিভাবে এগুলোর অপব্যবহার সম্পর্কেও সে জিজ্ঞাসিত হবে।

আর বিশ্বাসের স্বাধীনতা; এটি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা নিঃশর্তভাবে প্রদান করেন নি যে, প্রত্যেকে মানুষ তার খেয়াল খুশিমত আকিদা-বিশ্বাসে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে। বরং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা‘আলা প্রাপ্তবয়স্ক বুদ্ধিমান মানুষদের জন্য আবশ্যক করে দিয়েছেন যাতে তারা তাঁকে একমাত্র রব ও ইলাহ হিসেবে বিশ্বাস করে এবং বিনম্র চিত্তে শুধু তাঁরই আনুগত্য করে; আর এতদ্ভিন্ন

অন্য কিছু তিনি তাদের নিকট থেকে গ্রহণ করবেন না।

এর প্রমাণ: এই সুপ্রশস্ত পৃথিবী, যাতে আমরা বসবাস করি, তার অঞ্চলসমূহ আকস্মিকভাবে তৈরি করা হয় নি এবং তার উপকরণসমূহ এক অংশের উপর আরেক অংশ নিয়ম-কানুন ও চিন্তা-ভাবনা ছাড়া অনুমান করে জড়ো করা হয় নি; বরং তা সৃষ্টি করা হয়েছে সুস্পষ্ট নিয়ম-কানুন ও সুক্ষ্ম পদ্ধতির অনুসরণে। মহাশূন্যে উড়ন্ত অবস্থায় যা উঠা-নামা করে তা বিধিবিদ্ধ নিয়মেই করে; আর পানির মধ্যে যা ডুবন্ত, ভাসমান ও সাঁতরানো অবস্থায় নিক্ষিপ্ত, তাও এক

শক্তিশালী নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত; আর জমিনের মধ্যে যতসব উদ্ভিদ অঙ্কুরিত হয় এবং তার যে স্বাদ, রং ও ফল বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, তাও এক সুনিপুণ নিয়ম-কানুনের অনুগত। সুতরাং আসমান ও জমিনের প্রতিটি বস্তুই সৃষ্টি করা হয়েছে যথাযথভাবে। আর যে ব্যক্তি সত্য ও বাস্তবতার অনুসন্ধান করবে, সে শুধু এই বিস্তৃত সৃষ্টিরাজির পৃষ্ঠা উল্টাতে থাকবে যাতে সে এর প্রকৃত রহস্য অনুধাবন করতে পারে। ফলে তা তার সৃষ্টার প্রতি ঈমানকে বৃদ্ধি করবে, আর এই বিশ্বজগতের সুক্ষ্মতা ও নিপুণতা সম্পর্কে বিশ্বাস দৃঢ় করবে।

আর মানুষ মাত্রই জ্ঞানী ও গুণী হয়ে জন্মগ্রহণ করে না; তবে সে বিবেক-বুদ্ধি, কান ও চোখের মতো জ্ঞান ও অনুধাবনের সকল উপায়-উপকরণের যোগানসহ জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং তাকে বিবেক-বুদ্ধি, শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তিসহ সৃষ্টি করা হয়েছে যাতে সে সত্যকে উপলব্ধি করতে পারে এবং তার পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তি পেশ করতে পারে; এই জন্য নয় যে, সে বাতিলের উপর জীবনযাপন করবে এবং আঁকা-বাঁকা পথসমূহে ঘুরে বেড়াবে।

আর এই ময়দানে সীমাহীন স্বাধীনতা থাকবে যতক্ষণ তা সৃষ্টিরাজি ও তার নিদর্শনাবলীর মধ্যে বিদ্যমান থাকবে

এবং মানুষের উপকরণ ও ক্ষমতার গণ্ডিতে থাকবে।

আর এই নীতির উপর ভিত্তি করে আমরা বলব: চিন্তা ও গবেষণার স্বাধীনতা নিশ্চয়তাপ্রাপ্ত ও অবারিত; কিন্তু প্রবৃত্তি ও আসক্তির স্বাধীনতা সীমিত ও শর্তযুক্ত। কোনো বিবেক-বুদ্ধিই প্রবৃত্তি, আসক্তি ও চাহিদার পেছনে ছুটে চলা গ্রহণ করে না। কারণ, মানুষের শক্তি-সামর্থ্য সীমিত; সুতরাং যখন সেই শক্তি-সামর্থ্যকে খেল-তামাশা ও বাজে কাজে ব্যয় করা হয়, তখন আর তাতে ঐকান্তিক পথ সমর্থন এবং সত্য ও

কল্যাণের পথে চলার মতো শক্তি-সামর্থ্য অবশিষ্ট থাকে না।

আর তার উপর ভিত্তি করে বলা যায়, আমাদের বর্তমান বিশ্বে ও বস্তুবাদী সভ্যতায় যে ইতিবাচক কল্যাণকর দিকসমূহ লক্ষ্য করা যায়, তা চিন্তা ও গবেষণার স্বাধীনতার উত্তম ব্যবহারের ফসল; আর ক্ষতিকর এবং মানসিক ও অন্যান্য অস্থিরতার যেসব নেতিবাচক দিকসমূহ পরিলক্ষিত হয়, তা প্রবৃত্তি ও অযথা স্বাধীনতা প্রয়োগের ফসল।

আর এ জন্যই আমরা আস্থার সাথে জোর দিয়ে বলতে পারি: “যখন চিন্তার স্বাধীনতা অবারিত করা হবে, তখনই

মনকে প্রবৃত্তির অনুসরণ থেকে সংরক্ষণ করতে বা মুক্ত রাখতে হবে।”

তাই স্বাধীনতার বিষয়ে আলোচনার সময়ে আমাদের উচিত এ দু’টি বিষয়ের এবং এ দু’টির কর্মপন্থার মধ্যে পার্থক্য করা।

প্রকৃত স্বাধীনতা:

যখন আমরা বলছি যে, মানুষ আকিদা বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে স্বাধীন নয়; বরং তার বিশ্বাসকে এক আল্লাহকে রব ও মা‘বুদ হিসেবে দৃঢ় বিশ্বাসকরণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করাটা তার জন্য আবশ্যক, তার জন্য তিনি ভিন্ন অন্য কারও নিকট মস্তক

অবনত করা বা আল্লাহর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে অন্য কারও আনুগত্য করা অবৈধ।

আমরা এই কথা এ জন্য বলছি যে, এটাই এই জমিনে প্রকৃত স্বাধীনতার নিশ্চয়তা ও গ্যারান্টি দিয়ে। ... কেন?

কারণ, প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত মানবতা অনেক রাষ্ট্রের বিভিন্ন তাগুতের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে আসছে; যে তাগুতগুলোর নিকট মানবতা মস্তকাবনত হয়েছে এবং এর গর্দানসমূহ তার নিকট নীচ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে স্বাধীনতার সকল অর্থ বিলুপ্ত হয়ে গেছে এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যের নিকট মস্তকাবনতকারী ঐসব

ব্যক্তিদের মনের মধ্যে মানবতার সম্মানবোধের সকল চিহ্ন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

তাই বিনয়-নম্রতা, ভয়ভীতি, ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা, আনুগত্য ও আত্মসমর্পণ— সবকিছুই শুধু ঐ আল্লাহর জন্য হবে, যিনি চূড়ান্তভাবে সকল উত্তম গুণের অধিকারী; অতএব তিনি এককভাবে অভাবমুক্ত সর্বশক্তিমান ক্ষমতাবান প্রভাবশালী ন্যায়বিচারক। তিনি যুলুম করা থেকে পবিত্র; কারণ, যুলুম হল দুর্বলতা ও অক্ষমতার অন্যতম নিদর্শন। আর আল্লাহ তা‘আলা এই ধরনের সকল দুর্বলতা থেকে মুক্ত।

যে ব্যক্তি আল্লাহ ব্যতীত অন্যের অনুগত হয়, সে তার রব ব্যতীত অন্যের প্রতি যতটুকু অনুগত ও বশ্য, নিজের স্বাধীনতাকে ততটুকু সে হ্রাস করে।

আর তাগুত, যারা মানুষের সাধারণ স্বাধীনতা হরণ করছে, তারা অগণিত। যেমন, জ্ঞানপাপী আলেমগণ, পণ্ডিতবর্গ, ধর্মযাজক, জ্যোতিষীবৃন্দ, শাসকশ্রেণী, দিরহাম, দিনার (টাকা-পয়সা) ইত্যাদি।

আর এসব দল ও গোষ্ঠীর নিকট বিষয়টি এতই বাড়াবাড়ির পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, শেষ পর্যন্ত তারা তাদের প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশির সাথে মিলতাল করে রাসূলগণের উপর নাযিলকৃত

কিতাবগুলোকে পরিবর্তন করে এবং এগুলোর মধ্যে কিতাবের অংশ নয় এমন বানোয়াট বক্তব্যের অনুপ্রবেশ ঘটায়। এই কার্যক্রম তাদেরকে এমন পর্যায়ে উন্নীত করেছে যে, তারা নিজেদেরকে সওয়াব দান, শাস্তি প্রদান এবং পাপমোচন সনদ প্রদানের মাধ্যমে পাপ থেকে নিষ্কৃতিদান ও জান্নাতুল ফেরদৌসে যাওয়ার নিশ্চয়তা প্রদান করার অধিকারী বানিয়ে নিয়েছে।

আর আমাদের সমকালীন সময়ে এর নমুনা হল বস্তুবাদী বাড়াবাড়ি, ইতিহাস ও ঘটনাপ্রবাহের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা-

বিশ্লেষণ এবং প্রবৃত্তি, আসক্তি ও খেয়াল-খুশির দাসত্ব করা।

আর সেই কারণে আল্লাহর তাওহীদ (একত্ববাদ) এবং এক আল্লাহর আনুগত্যের দিকে আহ্বান করা মানেই প্রকৃত স্বাধীনতার সৌধ প্রতিষ্ঠা এবং যালিমগণ কর্তৃক মানুষের কাঁধে চাপিয়ে দেয়া অমানবিক শর্তসমূহ প্রত্যাখ্যানের আহ্বান। আর এরই মাধ্যমে মানুষের স্বাধীনতা ঐসব স্বৈরাচারী দম্ভীগণ কর্তৃক হরণ থেকে রক্ষা পাবে। ফলে মানুষ তার মাথাকে কোনভাবেই কোন মানুষের নিকটই (সে যা-ই হোক) অবনত বা নীচু করবে না। কারণ, তাহলে তা হবে বাতিলের কাছে

মাথা অবনত করা এবং স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের শামিল।

দীন গ্রহণের ব্যাপারে কোন জোর-জবরদস্তি নেই:

বিভিন্ন কারণে দীন ও আকিদা-বিশ্বাসের ব্যাপারে জোর-জবরদস্তি বা বল-প্রয়োগ করা প্রত্যাখ্যাত।

প্রথমত: বল-প্রয়োগের কারণে বাধ্য হয়ে যে ব্যক্তি ঈমান গ্রহণ করে, তার ঈমান তার কোন উপকারে আসবে না এবং আখেরাতে এর কোন প্রভাব পড়বে না। ঈমান অবশ্যই হতে হবে পরিতুষ্ট চিত্তে, সত্যিকার বিশ্বাস ও একান্ত আন্ততৃপ্তির ভিত্তিতে।

আল-কুরআনুল কারীমে ফেরাউন সম্পর্কে আলোচনা এসেছে যে, যখন সে পানিতে নিমজ্জিত হয়ে ডুবে যেতে লাগল, তখন সে আল্লাহ তা‘আলাকে রব ও মা‘বুদ বলে ঈমানের ও বিশ্বাসের ঘোষণা দিল; কিন্তু তা তার কোন উপকারে আসে না। আল-কুরআনের ভাষায়:

﴿ وَجَٰوَزۡنَا بِبَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ ٱلۡبَحۡرَ فَأَتۡبَعَهُمۡ فِرۡعَوۡنُ وَجُنُودُهُۥ بَغۡيٗا وَعَدۡوًاۖ حَتَّىٰٓ إِذَآ أَدۡرَكَهُ ٱلۡغَرَقُ قَالَ ءَامَنتُ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱلَّذِيٓ ءَامَنَتۡ بِهِۦ بَنُوٓاْ إِسۡرَٰٓءِيلَ وَأَنَا۠ مِنَ ٱلۡمُسۡلِمِينَ ٩٠ ءَآلۡـَٰٔنَ وَقَدۡ عَصَيۡتَ قَبۡلُ وَكُنتَ مِنَ ٱلۡمُفۡسِدِينَ ٩١ ﴾ [سورة يونس: ٩٠ - ٩١]

“আমি বনী ইসরাঈলকে সমুদ্র পার করালাম এবং ফেরাউন ও তার সৈন্যবাহিনী ঔদ্ধত্য সহকারে সীমালঙ্ঘন করে তাদের পশ্চাদ্ধাবন করল। পরিশেষে যখন সে ডুবে যাওয়ার উপক্রম হল, তখন সে বলল, ‘আমি বিশ্বাস করলাম বনী ইসরাঈল যাতে বিশ্বাস করে: নিশ্চয় তিনি ব্যতীত অন্য কোন ইলাহ নেই এবং আমি আত্মসমর্পণকারীদের অন্তর্ভুক্ত।’ এখন! ইতোপূর্বে তো তুমি অমান্য করেছ এবং তুমি অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলে!” — (সূরা ইউনুস: ৯০ - ৯১)

আবার অপর এক জাতির ঘটনা বর্ণনায় এসেছে:

﴿ فَلَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَا قَالُوٓاْ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَحۡدَهُۥ وَكَفَرۡنَا بِمَا كُنَّا بِهِۦ مُشۡرِكِينَ ٨٤ فَلَمۡ يَكُ يَنفَعُهُمۡ إِيمَٰنُهُمۡ لَمَّا رَأَوۡاْ بَأۡسَنَاۖ ... ٨٥ ﴾ [سورة غافر: ٨٤ - ٨٥]

“অতঃপর তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন বলল: আমরা এক আল্লাহতেই ঈমান আনলাম এবং আমরা তাঁর সাথে যাদেরকে শরীক করতাম তাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম। তারা যখন আমার শাস্তি প্রত্যক্ষ করল, তখন তাদের ঈমান তাদের কোন উপকারে আসল না।” — (সূরা গাফের: ৮৪ - ৮৫)

এমনকি অন্যায়-অপরাধ-গুনাহ ও অবাধ্যতা থেকে তওবা ততক্ষণ পর্যন্ত গ্রহণ করা হবে না, যতক্ষণ না তা হবে স্বেচ্ছায় এবং সত্য ও দৃঢ় সংকল্পের সাথে।

দ্বিতীয়ত: রাসূলগণ ও তাদের পরবর্তীতে আল্লাহর দীনের দা‘য়ীগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য মানুষের নিকট সত্য প্রচার করা এবং সত্যের বাণী পৌঁছিয়ে দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ; তারা জনগণের হেদায়াত, দীন গ্রহণ ও সত্যের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনের ব্যাপারে জিজ্ঞাসিত হবে না। সুতরাং মূল দায়িত্ব হলো সত্য প্রচার করা, সঠিক পথ দেখিয়ে দেয়া, উপদেশ দেয়া,

সৎকাজের আদেশ দেয়া এবং অন্যায় ও অপকর্ম থেকে নিষেধ করা। তবে হিদায়াতের অনুসারী বানানো ও ঈমান গ্রহণ করানোর দায়িত্ব রাসূলদের বা আল্লাহর দীনের দা‘য়ীদের উপর বর্তায় না।

আর এটি স্বাধীনতার অন্যতম একটি দিককে সুদৃঢ় করে; আর সে দিকটি হচ্ছে: মানুষ তার ও তার স্রষ্টার মধ্যকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব খবরদারি থেকে মুক্ত। মানুষ ও তার প্রতিপালকের মধ্যে সম্পর্ক সরাসরি ও মাধ্যমবিহীন; কোনো ব্যক্তিই তাতে কর্তৃত্ব খাটাতে পারে না— হোক সে ব্যক্তি ফেরেশ্তা কিংবা নবী!

আল-কুরআনুল কারীমে এ বিষয়ে জোড় দিয়ে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অধিকার প্রসঙ্গে এসেছে:

﴿ فَذَكِّرۡ إِنَّمَآ أَنتَ مُذَكِّرٞ ٢١ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ٢٢ ﴾ [سورة الغاشية: ٢١ - ٢٢]

“অতএব তুমি উপদেশ দাও; তুমি তো একজন উপদেশদাতা। তুমি তাদের কর্ম-নিয়ন্ত্রক নও।” — (সূরা গাশিয়া: ২১ - ২২)

তৃতীয়ত: মুসলিম রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অবস্থান:

যিম্মী ও অন্যান্য অমুসলিমগণ তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও ধর্মীয় বিষয়ে

কারও পক্ষ থেকে কোন প্রকার বাধাবিপত্তি ছাড়াই ইসলামী রাষ্ট্রের তত্ত্বাবধানে বসবাস করে এসেছে। বরং নবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায় আগমনের শুরুর দিকে পারস্পরিক আচার-ব্যবহারের যে কার্যকিুলাম ও শাসনপদ্ধতি তথা সংবিধান লিপিবিদ্ধ করেছিলেন, তাতে এসেছে: "... আর ইয়াহূদীদের মধ্যে থেকে যে ব্যক্তি আমাদের অনুসরণ করবে, তার জন্য সকল প্রকার সাহায্য, সহযোগিতা ও সান্ত্বনা থাকবে ... ইয়াহূদীগণ তাদের নিজেদের ধর্ম পালন করবে এবং মুসলিমগণও তাদের নিজেদের ধর্ম পালন করবে ... সকল প্রতিবেশী একই প্রাণের মত,

কেউ কারও ক্ষতিকারী হবে না, অপরাধীও হবে না...।”[৩] আর তিনি তাদের ধর্ম ও ধন-সম্পদের নিরাপত্তার স্বীকৃতি দিয়েছেন। একই অবস্থা ছিল নাজরানের খ্রিষ্টানদের সাথেও।

আর পরবর্তীতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণও অমুসলিমদের সাথে আচার-ব্যবহারের ক্ষেত্রে তাঁর নীতির অনুসরণ করেছেন। তাঁর খলিফা আবূ বকর রাদিয়াল্লাহু ‘আরহুর পক্ষ থেকে তাঁর কোন এক সেনাপতির প্রতি কথা ছিল: “... তোমরা এমন সম্প্রদায়ের নিকট দিয়ে আসা-যাওয়া করবে, যারা

মঠ বা গির্জাসমূহে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেছে; সুতরাং তোমরা তাদেরকে এবং তারা যে কাজে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করেছে, সে কাজ করার অবকাশ দাও ...।”

আর দ্বিতীয় খলিফা ওমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর অন্যতম অসিয়ত ছিল: “... আমি যিম্মীদের সাথে উত্তম আচরণের নির্দেশ দিচ্ছি, তাদের সাথে দেওয়া প্রতিশ্রুতি যথাযথভাবে পালনের নির্দেশ দিচ্ছি এবং আরও নির্দেশ দিচ্ছি তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে লড়াই করার। আর তাদের উপর শক্তি ও সামর্থ্যের

বাইরে কোন দায়িত্ব চাপিয়ে না দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছি...।”

আর চতুর্থ খলিফা আলী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর অন্যতম বক্তব্য ছিল: “... যার জন্য আমাদের যিম্মাদারী রয়েছে, তার রক্ত আমাদের রক্তের মত এবং তার রক্তমূল্য আমাদের রক্তমূল্যের মত...”।[৪]

আর ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাস সাক্ষী, শরী‘আত ও তার অনুসারীগণ ইসলামের ছায়াতলে বসবাসকারী বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীগণের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে যাতে তারা তাদের আকিদা-বিশ্বাস ও ধর্মের উপর বহাল থাকতে পারে এবং

তাদের কোন একজনকেও ইসলাম গ্রহণ করতে বাধ্য করা হয় না।

আর দূরবর্তী ও নিকটবর্তী সবার নিকট জানা কথা যে, তাদের সাথে এ ধরনের রক্ষণশীল আচরণ ইসলামী রাষ্ট্রের দুর্বল অবস্থানের কারণে হয় না, বরং এটা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রের মূলনীতি; এমনকি উম্মত যখন শক্তি-সামর্থ্যের শীর্ষে ছিল, তখনও তা মেনে চলা হতো। যদি তারা ব্যক্তির উপর বল প্রয়োগ করে তাদের আকিদা-বিশ্বাস বাধ্যতামূলকভাবে চাপিয়ে দিত, তবে তারা তাতে সক্ষম ছিল, কিন্তু তারা তা করে না।

চতুর্থত: মুসলিম ব্যক্তি যখন কোন কিতাবী মহিলাকে[৫] বিয়ে করবে, তখন সে তাকে তার ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য করবে না, বরং তার জন্য তার দীনের উপর অটল থাকার পূর্ণ অধিকার থাকবে এবং স্ত্রী হিসেবে সকল অধিকার সে পুরোপুরি ভোগ করবে।

রিদ্দাহ্ বা ধর্মত্যাগের বিধান:

ধর্মত্যাগের বিধান নিয়ে আলোচনার কয়েকটি দিক রয়েছে:

প্রথমত: বল প্রয়োগ ও জোর-জবরদস্তির উপর ভিত্তি করে ইসলাম ধর্মের প্রতি বিশ্বাস গ্রহণযোগ্য

নয়, যা ইতঃপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এভাবে ইসলামে প্রবেশকারী ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে ইসলামে প্রবেশ করে না; তবে সে যখন সন্তুষ্ট চিত্তে ও চিন্তা-ভাবনা করে ইসলাম ধর্মে প্রবেশ করবে, তখন তা গ্রহণযোগ্য হবে। আর এটা এই জন্য যে, সুস্থ বিবেকের সুক্ষ্ম দৃষ্টিমাত্রই এই দীনের পরিপূর্ণতা, বাতিল ধর্ম থেকে তার নিষ্কলুষতা, মানুষের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণে তার যথার্থতা এবং আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে যে স্বভাবের উপর সৃষ্টি করেছেন, সেই সুস্থ স্বভাবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণতার উপর জোর দিয়ে থাকে।

দ্বিতীয়ত: ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এমন কোন মুরতাদ তথা ধর্মত্যাগী পাওয়া দুষ্কর, যে এই দীনের প্রতি বিরাগভাজন ও ক্রোধের বশবতী হয়ে স্বধর্ম ত্যাগ করেছে; আর যদি পাওয়াও যায়, তবে সে হবে এই দুই জনের একজন:

— হয় সে স্বধর্ম ত্যাগ করেছে ষড়যন্ত্রের উদ্দেশ্যে, যাতে সে আল্লাহর দীনের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করতে পারে; যেমনিভাবে কিছু সংখ্যক ইয়াহূদী ইসলামী দাওয়াতের প্রথম যুগে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে দিনের প্রথম অংশে ঈমান গ্রহণ করত এবং

মুমিনদের মাঝে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে দিনের অপর অংশে কুফরী করত। কারণ, ইয়াহূদীরা হল আহলে কিতাব তথা তাওরাত নামক কিতাবের অনুসারী। সুতরাং তাদের পক্ষ থেকে যখন এ ধরনের ঘটনা ঘটবে, তখন তা ঈমানের দিক থেকে দুর্বল ব্যক্তিদের মাঝে খটকা সৃষ্টি করবে যে, এসব ইয়াহূদীরা যদি এই নতুন ধর্মের মধ্যে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি না পেত, তবে তারা তা থেকে ফিরে আসত না। অতএব তাদের উদ্দেশ্য ছিল বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা এবং আল্লাহর দীনের অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করা।

— অথবা এ মুরতাদ এমন এক ব্যক্তি হবে, যার ইচ্ছা হল স্বীয় প্রবৃত্তির লাগাম ছেড়ে দেয়া এবং দায়িত্ব ও কর্তব্যের বন্ধন ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করা।

তৃতীয়ত: ইসলাম থেকে বের হয়ে যাওয়ার মানে একটা সাধারণ শাসনব্যাবস্থা ও শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। কারণ, ইসলাম একটি পরিপূর্ণ দীন বা জীবনব্যবস্থার নাম; এটা যেমনিভাবে মানুষের সাথে তার প্রতিপালকের সম্পর্কের উপর গুরুত্বারোপ করে, ঠিক তেমনিভাবে তার সাথে অন্যান্য বনী আদমের সম্পর্কের উপরও গুরুত্বারোপ করে

থাকে; যেমন স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক, তার এবং তার আত্মীয়স্বজন ও প্রতিবেশীর মধ্যকার সম্পর্ক ইত্যাদি। আরও গুরুত্বারোপ করে তার ও তার শত্রুদের মধ্যকার শত্রুতা বা মিত্রতাভিত্তিক সম্পর্ক নিয়ে। আর তা এক অতুলনীয় ব্যাপকতার মাধ্যমে সবকিছুকে শামিল করে। চাই তা ইবাদাত সংক্রান্ত হউক, অথবা লেনদেন সম্পর্কিত; চাই সেটা অন্যায়-অপরাধ সংক্রান্ত হউক, অথবা বিচার-ফয়সালা সংক্রান্ত— এভাবে করে দুনিয়ার, বরং দুনিয়ার চেয়েও ব্যাপক সকল নিয়ম-কানুনই তাতে শামিল রয়েছে।

এর উপর ভিত্তি করে বলা যায়, ইসলামকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতেই দেখা উচিত, শুধুমাত্র বান্দার সাথে তার রবের সম্পর্কের মধ্যে সীমাবদ্ধরূপে নয়— যেমনটি অমুসলিমগণ ধারণা করে থাকে।

আর বিষয়টি যখন এ রকমই, তখন রিদ্দাহ্ বা ইসলাম ত্যাগ করা মানে একটা ব্যাপকভিত্তিক শৃঙ্খলার বাইরে যাওয়া।

চতুর্থত: রিদ্দাহ্ বা ইসলাম ত্যাগের শাস্তিরূপে মুরতাদ তথা ইসলাম ত্যাগকারী ব্যক্তির রক্তকে বৈধ করার ফলে যে ব্যক্তি ইসলামী রাষ্ট্র অথবা তার অধিবাসীদের মধ্যে ফিতনা-

ফ্যাসাদ ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে কপটতা করে এই দীনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করার ইচ্ছা পোষণ করে, তার জন্য এই শাস্তি সতর্কতা হিসেবে কাজ করবে এবং স্বীয় সিদ্ধান্ত সম্পর্কে নিঃসন্দীহান হতে উৎসাহ দেবে। সে যেন দেখে-শুনে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে তা (ইসলাম) গ্রহণ করে। কেননা, দীন হচ্ছে কিছু দায়িত্ব-কর্তব্য ও আনুষ্ঠানিকতা, যেগুলোর উপর অবিচল থাকা মুনাফিক ও গোপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির ইচ্ছাপোষণকারীদের পক্ষে কষ্টকর।

পঞ্চমত: সত্য ইসলামের প্রতি ঈমান আনার পূর্বে মানুষের জন্য বিশ্বাস

করার বা অবিশ্বাস করার অধিকার আছে। সুতরাং যখন সে প্রচলিত ধর্মসমূহের মধ্য থেকে যে কোন একটিকে গ্রহণ করবে, তখন তাতে কোন আপত্তি নেই এবং সে শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন ও বসবাস করার যাবতীয় অধিকার ভোগ করবে। কিন্তু যখন সে ইসলাম গ্রহণ করবে, তাতে প্রবেশ করবে এবং তার প্রতি ঈমান আনবে, তখন তার জন্য ইসলামকে আন্তরিকতার সাথে একনিষ্ঠভাবে গ্রহণ করা এবং সদা সর্বদায় তার আদেশ, নিষেধ এবং নীতিমালা ও শাখা প্রশাখার ক্ষেত্রে তার যাবতীয় হেদোয়াত ও দিকি

নির্দেশনা মেনে চলা আবশ্যক হয়ে যাবে।

অতঃপর আমরা বলব: মতপ্রকাশের স্বাধীনতার অর্থ কি কাউকে এই সমাজ প্রত্যাখ্যান করার ও তার নিয়ম-কানুনসমূহ বর্জন করার কোন সুযোগ করে দেওয়া? দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা অথবা শত্রুদের স্বার্থে গোয়েন্দাগিরি করা কি স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত? এর অঙ্গসমূহে নৈরাজ্য সৃষ্টির পায়তারা করা এবং তার সম্মানের নিদর্শন ও পবিত্র স্থানসমূহ নিয়ে কটাক্ষ করা কি স্বাধীনতার ভেতরে পড়ে? মুসলিমদেরকে এই মিথ্যা নীতি গ্রহণ

করে তুষ্ট হতে বলা নিঃসন্দেহে এক ধরনের বোকামি; আর মুসলিমদের নিকট যারা তাদের দীনের ভিতকে ধ্বংস করতে এবং তার পতাকাকে ভূলুণ্ঠিত করতে চায় তাদের জীবনের অধিকার রক্ষার আবদার রীতিমত বিস্ময়কর ব্যাপার!!

আর আমরা সর্বশক্তি দিয়ে বলছি যে, আকিদা-বিশ্বাস চুরি করা এবং সৎ-চরিত্র ও উত্তম আচরণের বিরোধিতা করা রীতিমত ইসলাম এবং তার কিতাব, তার নবী ও তার অনুসারীদের ঘৃণাকারী খ্রিষ্টান মিশনারি বিভিন্ন দল ও গোষ্ঠীর পেশায় পরিণত হয়েছে। তারা ক্লান্তিহীনভাবে সমাজ ব্যবস্থার

অবকাঠামোকে নড়বড়ে ও তাকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে সম্পূর্ণ উল্টে ফেলার জন্য ফিতনা-ফাসাদ ও এর উপায়-উপকরণসমূহকে উষ্কে দিচ্ছে।

আমাদের অধিকার জোর গলায় প্রকাশের দাবী আরো নিশ্চিত করে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার মত ‘স্বাধীন মতপ্রকাশের’ রাষ্ট্রসমূহের সে নির্লজ্জ অবস্থান, যা আমরা প্রত্যক্ষ করছি, সে সব মুসলিমদের ব্যাপারে যারা প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্মকে আঁকড়ে ধরছে এবং তাদের নারী-পুরুষগণ শালীন পোশাক-পরিচ্ছদ পড়তে শুরু করেছে। এতে মূলত তাদের

(ফ্রান্স, ব্রিটেন ও আমেরিকার) বিদ্বেষ অতি মাত্রায় বেড়েছে; বিশেষ করে পর্দা সমস্যার প্রেক্ষাপটে ফ্রান্সের জনগণের বিদ্বেষ। তাদের নিয়ম-কানুনের মধ্যে প্রত্যেক ধর্মের অনুসারীদের নিজ নিজ ধর্ম পালন করার অধিকার দেয়া সত্ত্বেও শান্তি ও নিরাপত্তার যুক্তি দিয়ে তাদের সাধারণ শাসন ব্যবস্থায় তাদের এই নগ্ন অবস্থান। আমাদের আরও অধিকার রয়েছে সেটা স্মরণ করার, যা প্রকাশ্যে চলছে রাশিয়া ও বুলগেরিয়ার মত রাষ্ট্রে সংখ্যালঘু মুসলিমদের উপর; এর বাইরে পর্দার অন্তরালে তাদের উপর যা চলছে তার কথা আর কী-ই বা বলা যায়।

অতঃপর সমসাময়িক অনেক শাসন ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের শাস্তির বিধান বিদ্যমান আছে; চাই তা মাদক চোরাকারবারীদের জন্য হউক অথবা অন্য কারও জন্য। আর তারা তো শুধু অপরাধ ও অপরাধ প্রবনতা কমানোর জন্য এবং সামগ্রিকভাবে সমাজকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার জন্যই এ মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বলবৎ রেখেছে। কিন্তু তাদের কেউ এ কথা বলে না যে, ঐসব গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের ব্যাপারে মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি তাদের স্বাধীনতার সাথে সাংঘর্ষিক। কারণ, এ লোকগুলো তাদের স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করছে, এমনকি অন্যের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ করছে

অথবা সর্ব-সাধারণের সরল-সোজা শান্তিপূর্ণ স্বাভাবিক জীবনযাপনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে।

আর সেখানে তারা মৃত্যুদণ্ডের বিধান রেখেছে বড় ধরনের খেয়ানত অথবা অনুরূপ কোন অপরাধের জন্য; অথচ এ সমস্ত খ্রিষ্টান মিশনারী ও তাদের মত সংস্থাগুলো এটাকে স্বাধীনতার সাথে সাংঘর্ষিক বা সমালোচনার ক্ষেত্র মনে করে না। এসব আমাদেরকে তা-ই স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যা এ গ্রন্থের প্রথমে আমরা উল্লেখ করেছিলাম যে, তাদের এ সকল প্রশ্ন উত্থাপনের ব্যাপারে সৎ নিয়তে আমাদের সন্দেহ রয়েছে।

আর এই অনুচ্ছদেরে শষে প্রান্তে এসে ধর্মরে অনুসরণ এবং ধর্ম ত্যাগরে স্বাধীনতার প্রসঙ্গে আমি মুসলমিদরে সাথে অপরাপর ধর্মরে অনুসারীগণরে আচরণগত অবস্থান, যুলুম-নপিীড়ন, ধর্মীয় গোড়ামী ও গোপন বদি্বষেরে কতপিয় জীবন্ত ঘটনার উদ্ধৃত পিশে করছি, যা তারা যখোনে জয়লাভ করছে সখোনে তারা ঘটয়িছে।

লখেক ‘গবিন’ বলনে:

“প্রভুর সবেক ক্রুসডোররা ১০৯৯ খ্রষি্টাব্দরে ১৫ জুলাই যখন বাইতুল মাকদাসরে কর্তৃত্ব গ্রহণ করে, তখন তারা প্রভুর সম্মানার্থে সত্তর হাজার মুসলমিকে জবাই করার সদি্ধান্ত

গ্রহণ করে এবং সেই দিন তারা তিন দিন তিন রাত ধরে জবাইখানায় চলমান জবাই প্রক্রিয়ায় বৃদ্ধ, শিশু ও নারীদের প্রতি কোন প্রকার অনুকম্পা প্রদর্শন করে নি; তারা বাচ্চা ছেলেদের মাথাগুলোকে দেয়ালের সাথে আছড়িয়ে টুকরা টুকরা করেছে, আর দুগ্ধ পানকারী শিশুদেরকে বাড়ির ছাদের উপর থেকে ফেলে দিয়েছে, আর পুরুষ ও নারীদেরকে আগুন দিয়ে ঝলসিয়ে দিয়েছে এবং তারা পেট চিরে যাচাই করে দেখেছে যে, সেখানকার অধিবাসীগণ কোন প্রকার স্বর্ণ গিলে ফেলেছে কিনা ...।” অতঃপর লেখক বলেন: “এত কিছুর পরেও তাদের জন্য কিভাবে শোভনীয় হয় যে, তারা বিনয়ের সাথে

আল্লাহর নিকট বরকত ও ক্ষমা প্রার্থনা করে।”[৬]

আর ‘গুসতাফ লুবুন’ স্পেনের মুসলিমদের সাথে ইউরোপীয় খ্রিষ্টান সৈন্যগণের আচরণ প্রসঙ্গে বলেন:

“যখন ১৬১০ খ্রিষ্টাব্দে আরব মুসলিমদেরকে বিতাড়িত করল, তখন তাদেরকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে সকল প্রকার পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল; ফলে তাদের অধিকাংশকে হত্যা করা হয়েছে; আর এই নির্বাসনের মেয়াদকালে তিন মিলিয়ন মানুষকে হত্যা করা হয়েছিল। অথচ যখন আরবগণ স্পেন বিজয় করেছিল, তখন তারা সেখানকার অধিবাসীদেরকে তাদের

ধর্মীয় স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার অধিকার দিয়েছিল এবং তারা তাদের সাথে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতি ও তাদের নেতৃত্বের যথাযথ মূল্যায়ন ও সংরক্ষণ করেছিল ... আর আরবদের এই উদারতা স্পেনে তাদের দীর্ঘ শাসনকাল পর্যন্ত চলছিল; বর্তমানকালে এই ধরনের ঘটনা মানুষের মাঝে খুব কমই সংঘটিত হয়ে থাকে।”[৭]

আর আমাদের আজকের এই দিনগুলোতে ফিলিস্তিনের অধিবাসীগণ কেন্দ্রীক ইয়াহূদীদের সনদ বা চুক্তিপত্রে আমরা পাঠ করি:

“হে ইসরাঈলের বংশধরগণ! তোমরা সৌভাগ্যবান হও এবং ভালভাবে আনন্দ প্রকাশ কর; অচিরেই এমন এক সময় আসছে, যাতে আমরা এসব পশুগুলোকে তাদের আস্তাবলে (পশুশালায়) একত্রিত করব, তাদেরকে আমাদের ইচ্ছার অধীন করব এবং আমাদের খেদমত তথা সেবা করার জন্য নিয়োজিত করব।”[৮]

সমাজতান্ত্রিক দেশ রাশিয়ার মধ্যে সরকার তুর্কিস্তান প্রদেশে চৌদ্দ হাজার মাসজিদ বন্ধ করে দিয়েছে, আর ওরাল অঞ্চলে বন্ধ করে দিয়েছে সাত হাজার মাসজিদ এবং ককেশাস অঞ্চলে বন্ধ করে দিয়েছে চার হাজার মাসজিদ।

আর এসব মাসজিদের অধিকাংশই পতিতালয়, মদের দোকান, অশ্বশালা ও চতুষ্পদ জন্তুর খোঁয়াড়ে পরিণত হয়েছে; আর এর উপরে রয়েছে মুসলিম সম্প্রদায়ের শারীরিক নির্যাতন ও নিষ্পেষণের খবর। আর আমাদের জন্য এটা জানাই যথেষ্ট যে তারা বিভিন্ন প্রকারের শাস্তি ও হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে ২৫ (পঁচিশ) বছরের ব্যবধানে ২৬ (ছাব্বিশ) মিলিয়ন মুসলিমকে হত্যা করেছে।

আর রাশিয়ান বলয়ের কমিউনিষ্ট রাষ্ট্রসমূহ তার (রাশিয়ার) নীতির পূর্ণ অনুসরণ করেছে; সুতরাং এক যুগোশ্লাভিয়ায় ‘টিটু’ প্রায় এক

মিলিয়ন মুসলিমকে নিঃশেষ করে দিয়েছে।

আর এই বর্তমান বছরসমূহের মধ্যে ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া ও পূর্ব আফ্রিকায় সকল ইসলামী আন্দোলন ও ইসলামের দিকে আহ্বানকারীদের সাথে প্রকাশ্যভাবে দমন ও নিপীড়ন চলছে; তাছাড়া অনেক রাষ্ট্রে গোপনীয় কায়দায় তো আছেই।

সুতরাং তুমি স্বাধীনতা দেখতে পাচ্ছ কোথায়? তুমি কি দেখতে বা বুঝতে পাচ্ছ, কে পক্ষপাতিত্বকারী, গোঁড়া ও সাম্প্রদায়িক এবং কে সহিষ্ণু ও উদার??

দাসপ্রথা:

‘দাসপ্রথার নিন্দা বা দাসপ্রথার বিলুপ্তি না করে দাসের উপর স্বাধীন মানুষের প্রাধান্য দেয়ার পক্ষ সমর্থনের অর্থ কী?’

খ্রিষ্টধর্মের প্রচারক ও দ্বীনে ইসলামের প্রচার-প্রসারে বিঘ্ন সৃষ্টিকারীদের পক্ষ থেকে দাসপ্রথা সম্পর্কিত আলোচনা করা এবং সে প্রসঙ্গে প্রশ্ন উত্থাপনের বিষয়টি বিবেকবান মানুষের অন্তরে ভাবান্তর সৃষ্টি করে। আর এসব প্রশ্নের আড়ালে প্রকৃত গোপন উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি অভিযোগের আঙুল উঠা স্বাভাবিক।

এই দাসত্ব প্রথাই ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্টানদের মধ্যে নির্যাতনীয় পন্থায় স্বীকৃত ও প্রমাণিত; আর তাদের কিতাবসমূহে এই প্রসঙ্গে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে এবং পরিপূর্ণভাবে তার স্বাচ্ছন্দ অনুমোদন রয়েছে। সুতরাং তাদের যে বিষয়টি প্রথমেই দৃষ্টির সামনে পড়ে তা হলো: কিভাবে খ্রিষ্টান গির্জাসমূহ মানুষদেরকে খ্রিষ্টান বানানোর দাওয়াত দিতে পারে, যেখানে খোদ খ্রিষ্টধর্মই দাসত্ব প্রথা ও তা বিধিসিম্মত হওয়ার কথা বলে? অন্য অর্থে বলা যায়; কিভাবে তারা এই ব্যাপারটি নিয়ে অভিযোগ উত্থাপন করছে অথচ তারা তাতে কান বরাবর ডুবে আছে?

আর ইসলামে দাসপ্রথার বিষয়টিকে যদি উভয় ধর্মের দৃষ্টিভঙ্গির মাঝে এবং ইসলাম আগমনের সময়ের দাসপ্রথার সাথে তুলনামূলকভাবে পর্যালোচনা করা হয়, তবে সেটো সম্পূর্ণ ভিন্নিরূপে প্রতিভাত হবে।

আর কোনো গবেষক যখনই দেখে এসব প্রশ্ন, যেগুলোতে খ্রিষ্টান মিশনারিরা তাদের ভাষাকে ব্যাপকভাবে তাদের সাধ্যমতো কাজে লাগিয়েছে যাতে তারা ইসলামকে অপমান করতে পারে; তখন সে গবেষক এই বিষয়ে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও আধুনিক সভ্যতার নিকট যা আছে, সে দিকে ইঙ্গিত দিয়ে ব্যাপকভাবে অবশ্যই কথা বলবে

অতঃপর আমরা ইসলামে যা কিছু আছে তা নিয়ে আলোচনা করব। ইসলাম এ ব্যাপারে অনেক মিথ্যা অভিযোগ ও অপবাদের সম্মুখীন হয়েছে, যেখানে অপরাধে ডুবে থাকা কিছু শক্ত অপরাধী মুক্তি পেয়ে গিয়েছে; এমনকি দুঃখজনকভাবে তাদের দিকে অভিযোগের আঙুল দিয়েও ইঙ্গিত করা হয় না!

ইসলাম ও দাসপ্রথা:

ইসলাম স্বীকৃতি দেয় যে, আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীল করে সৃষ্টি করেছেন, তার উপর শরী‘আতের দায়িত্ব ও কর্তব্য দিয়েছেন এবং এগুলোর ব্যাপারে তাঁর

ইচ্ছা ও পছন্দের উপর ভিত্তি করে পুরস্কার ও শাস্তির ব্যবস্থা করেছেন। আর এই ইচ্ছাকে সীমাবদ্ধ করা অথবা এই পছন্দকে হরণ করার কোন অধিকার কোন মানুষের নেই। আর যে ব্যক্তি এই ব্যাপারে দুঃসাহস করবে, সে হবে যালিম ও সীমালঙ্ঘনকারী।

এই বিষয়ে এটা ইসলামের সুস্পষ্ট বিধান ও মূলনীতি। আর যখন প্রশ্ন উত্থাপিত হবে: কীভাবে ইসলাম দাসপ্রথাকে বৈধতা দেয়?

তার জবাবে আমরা সর্বশক্তি দিয়ে ও নির্দ্বিধায় বলব: দাসত্ব প্রথা ইসলামে বৈধ; কিন্তু ইনসাফের দৃষ্টিভঙ্গি ও সত্য উৎঘাটনের লক্ষ্য

থাকলে দেখতে হবে দাসপ্রথার উৎস ও কারণসমূহ বিশ্লেষণপূর্বক ইসলামে দাসপ্রথার খুঁটিনাটি বিধানসমূহ; অতঃপর আরও দেখতে হবে দাস-দাসীর সাথে আচার-ব্যবহার, অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে স্বাধীন ব্যক্তির সাথে তার সমতা বিধান; স্বাধীনতা ও মুক্তি লাভের পদ্ধতি এবং শরী‘আতে এর বহু ধরনের দরজার কথা; বিশেষ করে যখন এসব পদ্ধতির সাথে অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শের তুলনামূলক পর্যালোচনা করা হয়। এছাড়াও স্মরণে রাখতে হবে সভ্যতা, আধুনিকতা ও প্রগতির চাদরে আবৃত এই পৃথিবীর নতুন ধরনের দাসপ্রথার কথা। এখানে পাঠক লক্ষ্য করবেন যে,

আমি এ বিষয়ের উপর অনেক পরিমাণে আল-কুরআনুল কারীমের বক্তব্য এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ও নির্দেশনার সাহায্য গ্রহণ করব— এর গুরুত্বের কথা বিবেচনা করে এবং এ কথা জোর দিয়ে বলার জন্য যে, ত্রুটিপূর্ণ কাজকর্ম দ্বারা ইসলামকে বিচার-বিশ্লেষণ করা বৈধ নয়।

আর এই ব্যাপারে আমরা বলব: ইসলাম দাস-দাসীর ব্যাপারে যে চমৎকার অবস্থান গ্রহণ করেছে, অন্য কোন গোষ্ঠী বা ধর্মের কেউ সে অবস্থান গ্রহণ করে না। আর এই দাসপ্রথা সম্পর্কিত সকল বিষয় যদি এই নিয়ম-

নীতির আলোকে চলত, তবে কখনো সৃষ্টি হত না এসব সমস্যা, যেগুলোর মূলে রয়েছে অপহরণ, ছিনতাই, বলপ্রয়োগ অথবা যে কোন ধরনের প্রতারণার মাধ্যমে প্রাচীন ও আধুনিক কালে স্বাধীন ব্যক্তিকে দাস বানানো। এর ফলেই দাসপ্রথার বিষয়টি অত্যন্ত ন্যাক্কারজনকভাবে ও নিকৃষ্ট পদ্ধতিতে এত কলঙ্কিত বিষয়ে রূপ নিয়েছে। মূলত দাসপ্রথা এই অপহরণ পদ্ধতির মাধ্যমেই পৃথিবীর সকল মহাদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। বরং এ পদ্ধতিই বিগত শতাব্দীগুলোতে ইউরোপ ও আমেরিকায় দাসপ্রথার বড় উৎস ছিল।

আর ইসলাম এই ব্যাপারে তার বক্তব্যসমূহের মাধ্যমে দৃঢ়সঙ্কল্প ও চূড়ান্ত অবস্থান গ্রহণ করেছে। এক হাদিসে কুদসীর মধ্যে এসেছে:

« قال الله ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، ومن كنت خصمه خصمته. رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره» (أخرجه البخاري).

“আল্লাহ তা‘আলা বলেন: আমি কিয়ামতের দিন তিন শ্রেণির মানুষের প্রতিপক্ষ। আর আমি যার প্রতিপক্ষ হব, তাকে পরাজিত করবই। তন্মধ্যে এক ব্যক্তি হল এমন, যে আমার নামে প্রতিশ্রুতি দিয়ে এবং শপথ করে,

অতঃপর তা ভঙ্গ করে। আরেক ব্যক্তি হল যে স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে, অতঃপর তার বিনিময় ভক্ষণ করে। আর তৃতীয় আরেক ব্যক্তি হল যে ব্যক্তি কোন শ্রমিক নিয়োগ করে, অতঃপর তার থেকে পুরাপুরি কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পারিশ্রমিক প্রদান করে না।" — (বুখারী, কিতাবুল বুয়ু, বাব নং- ১০৬, হাদিস নং- ২১১৪)।

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন:

« ثَلاَثَةٌ لاَ يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُمْ صَلاَةً مَنْ تَقَدَّمَ قَوْمًا وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ وَرَجُلٌ أَتَى الصَّلاَةَ دِبَارًا (بمعنى بعد خروج وقتها). وَرَجُلٌ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا». (أخرجه

أبو داود و ابن ماجه، كلاهما من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقيّ).

“তিন শ্রেণীর মানুষের সালাত (নামায) আল্লাহ তা‘আলা কবুল করবেন না; এক ব্যক্তি হলেন যিনি কোন সম্প্রদায়ের ইমামতি করেন, অথচ ঐ সম্প্রদায়ের লোক তাকে অপছন্দ করে। আরেক ব্যক্তি হল যে সালাতের ওয়াক্ত অতিবাহিত হলে সালাত আদায় করতে আসে এবং তৃতীয় আরেক ব্যক্তি হল যে স্বাধীন ব্যক্তিকে ধরে গোলামে পরিণত করে।” — (আবূ দাউদ, সালাত অধ্যায়, বাব নং- ৬৩, হাদিস নং- ৫৯৩

; ইবনু মাজাহ, কিতাবু ইকামাতিস সালাত ওয়াসসুন্নাতু ফীহা, বাব নং- ৪৩, হাদিস নং- ৯৭০ ; তারা উভয়ে আবদুর রহমান ইবন যিয়াদ আল-ইফরিকীর বর্ণনা থেকে বর্ণনা করেন)।

মজার ব্যাপার হলো, আপনি আল-কুরআন ও সুন্নাহের বক্তব্যসমূহের মধ্যে এমন একটি বক্তব্যও খুঁজে পাবেন না, যা মানুষকে দাস-দাসী বানানোর কথা বলে; কিন্তু আল-কুরআনের আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্যসমূহ থেকে শতাধিক বক্তব্যের সমাবেশ আছে, যেগুলো দাসকে গোলামী থেকে

মুক্তি ও আযাদী দিতে আহ্বান করে ও উৎসাহিত করে।

ইসলামের অভ্যুদয়ের সময় দাসত্বের উৎস ছিল বহু রকমের; কিন্তু দাসত্ব থেকে মুক্তির কোনো পদ্ধতি ও উপায়-উপকরণ ছিল না বললেই চলে। অতঃপর ইসলাম এসে তার শরী‘আত তথা নিয়ম-নীতির মধ্যে এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করল; ফলে মুক্তি ও আযাদী অর্জনের বহু ক্ষেত্র তৈরি করল এবং বন্ধ করল দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধকরণের অনেক পথ; আর অনেক অসিয়তের প্রবর্তন করল, যা এসব পথকে বন্ধ করে দেয়।

দাসপ্রথার অন্যতম পূর্বলক্ষণ ছিল বিভিন্ন যুদ্ধের সময়ে বন্দীকরণ পদ্ধতি। আর প্রত্যেক যুদ্ধেই আবশ্যকীয় ব্যাপার ছিল যুদ্ধবন্দী। তখনকার দিনের স্বতঃসিদ্ধ প্রথা অনুযায়ী যুদ্ধবন্দীদের মান-সম্মান ও অধিকার বলতে কিছু ছিল না; আর তাদের ছিল দু'টি উপায়: হয় তাদেরকে হত্যা করা হত, আর না হয় দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ করা হত।

কিন্তু ইসলাম এসে তৃতীয় এক পদ্ধতির প্রতি উৎসাহিত করল; আর তা হচ্ছে: যুদ্ধবন্দীর সাথে উত্তম ব্যবহার করা ও তাকে মুক্ত করে দেয়া। আল-

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿ وَيُطۡعِمُونَ ٱلطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ مِسۡكِينٗا وَيَتِيمٗا وَأَسِيرًا ٨ إِنَّمَا نُطۡعِمُكُمۡ لِوَجۡهِ ٱللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمۡ جَزَآءٗ وَلَا شُكُورًا ٩ ﴾ [سورة الإنسان: ٨ - ٩]

“খাবারের প্রতি মহব্বত সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে খাবার দান করে এবং বলে, কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যেই আমরা তোমাদেরকে খাবার দান করি, আমরা তোমাদের নিকট থেকে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও না।” — (সূরা আল-ইনসান: ৮ - ৯)

আয়াতটরি মর্মস্পর্শতা ও উৎসাহদান মন্তব্যরে অবকাশ রাখে না। আর ইসলামরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম চরত্রিরে আঙ্গনিায় বলনে:

« فكوا العاني يعني الأسير وأطعموا الجائع وعودوا المريض» (أخرجه البخاري).

“তোমরা যুদ্ধবন্দীকে মুক্তি দাও, ক্ষুধার্ত ব্যক্তকিে খাবার দান কর এবং রুগ্ন ব্যক্তকিে সবো কর।” — (বুখারী, কতিাবুল জহিাদ ওয়াস সয়িার, বাব নং- ১৬৮, হাদসি নং- ২৮৮১)।

সর্বপ্রথম মুসলমি ও তাদরে শত্রুগণরে মধ্যে সংঘটতি বদর যুদ্ধে মুসলমিগণ বজিয় লাভ করনে এবং তাতে

আরবের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যুদ্ধবন্দী হিসেবে আটক হয়। তারা বন্দী জীবনে নিপতিত হল, যেমনিভাবে রোম ও পারস্য সম্রাটদের মতো গণ্যমান্য ও সম্মানিত ব্যক্তিবর্গ বড় বড় রাষ্ট্রের যুদ্ধসমূহে যুদ্ধবন্দিত্বের শিকার হতো। যদি তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হত, তবে তা তাদের জন্য যথাযথ হত; কেননা তারা ইসলামী দাওয়াতের সূচনা লগ্নে মুসলিমদেরকে অত্যন্ত কঠিন কষ্ট দিয়েছিল। কিন্তু, আল-কুরআনুল কারীম নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীদেরকে দিকনির্দেশনা দিচ্ছে এইভাবে:

﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ قُل لِّمَن فِيٓ أَيۡدِيكُم مِّنَ ٱلۡأَسۡرَىٰٓ إِن يَعۡلَمِ ٱللَّهُ فِي قُلُوبِكُمۡ خَيۡرٗا يُؤۡتِكُمۡ خَيۡرٗا مِّمَّآ أُخِذَ مِنكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡۚ وَٱللَّهُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ ٧٠ وَإِن يُرِيدُواْ خِيَانَتَكَ فَقَدۡ خَانُواْ ٱللَّهَ مِن قَبۡلُ فَأَمۡكَنَ مِنۡهُمۡۗ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ٧١ ﴾ [سورة الأنفال: ٧٠ - ٧١]

“হে নবী! তোমাদের করায়ত্ত
যুদ্ধবন্দীদেরকে বল, আল্লাহ যদি
তোমাদের হৃদয়ে ভাল কিছু দেখেন, তবে
তোমাদের নিকট থেকে যা নেয়া হয়েছে,
তা অপেক্ষা উত্তম কিছু তিনি
তোমাদেরকে দান করবেন এবং
তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ
ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তারা তোমার
সাথে বিশ্বাসভঙ্গ করতে চাইলে, তারা

তো পূর্বে আল্লাহর সাথেও বিশ্বাসভঙ্গ করেছে; অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তাদের উপর শক্তিশালী করেছেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।” — (সূরা আল-আনফাল: ৭০ - ৭১)

এসব যুদ্ধবন্দীগণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুয়তের শুরু থেকে এই যুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত অধিকাংশ মুসলিমদের সাথে ভয়াবহ রকমের নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক আচরণ করেছিল। তারা চেয়েছিল তাদেরকে ধ্বংস করে দিতে অথবা তাদেরকে দখল করতে। তাদেরকে এমনি-এমনি খুব দ্রুত ছেড়ে দেয়াটা কি

আপনি উত্তম-নীতি বলে গণ্য করবেন??

জেনে রাখা দরকার যে, এই বিষয়টি রাষ্ট্রের উচ্চপর্যায়ের স্বার্থের সাথে জড়িত। এই জন্য আপনি দেখতে পাবেন যে, মুসলিমগণ বদরে[৯] যুদ্ধবন্দীদের নিকট থেকে বিনিময় গ্রহণ করেছেন; আর মক্কা বিজয়ের দিন মক্কাবাসীদের উদ্দেশ্যে বলা হয়েছিল:

"اذهبوا فأنتم الطلقاء"

“যাও, তোমার আজ সকলেই মুক্ত”।

বনী মুস্তালিকের যুদ্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরাজিত গোত্রের এক যুদ্ধবন্দিনীকে

বিয়ে করে ঐ বন্দিনীর মর্যাদাকে সমুন্নত করেছিলেন; কারণ, তিনি ছিলেন ঐ সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দের অন্যতম একজনের কন্যা। ফলে মুসলিমগণের সকলেই ঐসব যুদ্ধবন্দীদের সবাইকে মুক্ত করে দিয়েছিলেন।

আর এ থেকেই দাসত্বের আশ্রয় নেওয়ার সীমিত পরিসর ও ক্ষুদ্র স্থানগুলো জানতে পারবেন। দাসপ্রথাকে একেবারে বিলুপ্ত করে দেওয়া হয় নি; কারণ, সত্য ও ন্যায়ের বিরোধী এই কাফির যুদ্ধবন্দী হয় ছিল যালিম, অথবা যুলুমের সহায়তাকারী, অথবা যুলুম বাস্তবায়নের অথবা যুলুমের প্রতি স্বীকৃতি প্রদানের এক

উপকরণ। তাই তার স্বাধীনতা ছিল অন্যদের উপর তার সীমালঙ্ঘন, বাড়াবাড়ি ও অহংকারের সুযোগ।

তবুও এর জন্য এবং অনুরূপ ব্যক্তিদের জন্য স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করার সুযোগ ইসলামে অনেক এবং ব্যাপক। তেমনিভাবে ইসলামে দাস-দাসীদের সাথে আচার-আচরণ ও লেনদেনের পদ্ধতিসমূহে ন্যায়পরায়ণতা ও সম্প্রীতির সমাবেশ ঘটিয়েছে।

স্বাধীনতা লাভের উপায়-**উপকরণসমূহের মধ্য থেকে অন্যতম কতগুলো উপকরণ হল:** যাকাতের এক অংশ গোলাম মুক্তির জন্য নির্ধারণ; ভুলজনিত হত্যার কাফ্‌ফারা, যিহার ও

শপথের কাফ্ফারা; রমযানে ইচ্ছাকৃত রোযাভঙ্গের কাফ্ফারা। এছাড়াও রয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় গোলাম মুক্তকরণে সাধারণভাবে সহানুভূতিমূলক আবেদন।

ঐসব দাস-দাসীদের প্রতি ন্যায় ও অনুকম্পার ভিত্তিতে কতিপয় কাঙ্ক্ষিত আচার-আচরণের সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত নিম্নে দেওয়া হলো:

১. তাদের মনিবদের মত খাদ্য ও পোশাক-পরিচ্ছদের নিশ্চয়তা:

আবূ দাউদ র. মা‘রুর ইবন সুয়াইদ থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: আমরা ‘রবযা’[১০] নামক স্থানে আবূ যরের

নিকট উপস্থিত হলাম, অতঃপর দেখে গেলে যে, তাঁর গায়ে এবং তাঁর গোলামের গায়ে একই ধরনের চাদর। অতঃপর তিনি বললেন: হে আবূ যর! আপনি যদি আপনার গোলামের চাদরটা আপনার চাদরের সাথে মিলিয়ে ব্যবহার করতেন, তবে তা সুন্দর হত; আর তাকে আপনি অন্য আরেকটি কাপড় পড়িয়ে দিতেন? তখন তিনি (আবূ যর) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি:

«هم إخوانكم جعلهم الله تحت أيديكم فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما يغلبه فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه» (أخرجه البخاري).

“তারা তোমাদের ভাই, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন; সুতরাং আল্লাহ তা‘আলা যার ভাইকে তার অধীন করে দিয়েছেন, সে যেন তাকে তাই খাওয়ায় যা সে নিজে খায়; আর সে যেন তাকে পোশাক হিসেবে তাই পরিধান করায় যা সে নিজে পরিধান করে এবং যে বোঝা বহন করতে সে অক্ষম, সে যেন এমন বোঝা তার উপর চাপিয়ে না দেয়। তার পরেও যে বোঝা বহন করতে সে অক্ষম, এমন বোঝা যদি তার উপর চাপিয়ে দেয়, তবে সে যেন তাকে সহযোগিতা করে।” — (বুখারী, কিতাবুল আদব, বাব নং- ৪৪, হাদিস নং- ৫৭০৩)।

২. তাদের সম্মান রক্ষা করা:

আবূ হুরায়রা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, তাওবার নবী আবুল কাসেম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন:

«من قذف مملوكه وهو بريء مما قال جلد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» (أخرجه البخاري).

“যে ব্যক্তি তার নির্দোষ গোলামকে অপবাদ দেবে, কিয়ামতের দিন তাকে অপবাদের শাস্তি স্বরূপ বেত্রাঘাত করা হবে; তবে সে যা বলেছে তা যথাযথ হলে ভিন্ন কথা।” —(বুখারী, কিতাবুল হুদুদ, বাব নং- ৩১, হাদিস নং- ৬৪৬৬)।

ইবনু ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তাঁর গোলামকে স্বাধীন করে দিয়ে মাটি থেকে এক খণ্ড কাঠ অথবা অন্য কিছু হাতে নিয়ে বললেন: এর মধ্যে আমার জন্য এমন কোন প্রতিদান নেই, যা এর সমান হতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতে শুনেছি:

« مَنْ لَطَمَ مَمْلُوكَهُ أَوْ ضَرَبَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ ».(أخرجه أبو داود و مسلم).

“যে ব্যক্তি তার গোলামকে চড় মারলো অথবা প্রহার করল, তবে তার কাফ্ফারা হলো তাকে মুক্ত করে দেওয়া।” —(আবূ দাউদ, আদব, বাব নং- ১৩৪, হাদিস নং- ৫১৭০ ; মুসলিম,

আইমান, বাব নং- ৮, হাদিস নং- ৪৩৮৮)।

৩. দীন ও দুনিয়ার বিষয়ে মর্যাদাবান গোলামকে স্বাধীন ব্যক্তির উপর প্রাধান্য দেওয়া:

সালাতে গোলামের ইমামতি করাটা শুদ্ধ। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহার একজন গোলাম ছিল, সে সালাতে তাঁর ইমামতি করত ... এমনকি মুসলিমগণকে গোলামের কথা শ্রবণ করা ও তার আনুগত্য করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যখন সে তাদের শাসন ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং অন্যদের থেকে অধিক যোগ্য হয়।

স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার; আপতিত কোনো কারণ ব্যতীত কোন ব্যক্তির এই অধিকার হরণ করা যায় না। আর ইসলাম যখন দাসপ্রথাকে নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে গ্রহণ করেছে (যা আমরা পরিষ্কারভাবে আলোচনা করেছি), তখন ইসলাম সেই মানুষকে দাস করেছে যে তার স্বাধীনতার চূড়ান্ত অপব্যবহার করেছে। ফলে যখন সে কোনো সীমালঙ্ঘনের যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পরে যুদ্ধবন্দী হবে, তখন তাকে যুদ্ধবন্দিত্বের সময়কালীন আটক রাখা একটি সঠিক আচরণ।

আর যখন কোনো কারণে মানুষ দাস-দাসীতে রূপান্তরিত হয়; অতঃপর যখন তার পথভ্রষ্টতা থেকে ফিরে আসে, তার অতীতকে সে ভুলে যায় এবং সে এমন মানুষ হয়ে যায় যে অপকর্ম থেকে দূরে ও সৎকর্মের নিকটবর্তী, তখন তার স্বাধীনতা লাভের আবেদন মঞ্জুর করা হবে কি?

ইসলাম তার আবেদন মঞ্জুর করার পক্ষে অভিমত পেশ করে; ফিকাহবিদিগণের কেউ কেউ এই আবেদন মঞ্জুর করাকে আবশ্যক মনে করেন এবং কেউ কেউ এই আবেদন মঞ্জুর করারকে মুস্তাহাব (পছন্দনীয়) মনে করেন।

আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসদের ব্যাপারে অনেকে ওসিয়ত করেছেন। এ কথা প্রমাণিত যে, তিনি যখন সাহাবাদের মাঝে বদরের যুদ্ধের যুদ্ধবন্দীদের বণ্টন করেন, তখন তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যে করে বলেছিলেন: "استوصوا بالأسرى خيراً" (তোমরা যুদ্ধবন্দীদের সাথে ভালো ব্যবহার কর)।[১১]

বর্ণিত আছে যে, ওসমান ইবন আফফান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কোন অপরাধ করার কারণে তাঁর গোলামের কান মলে দিয়েছিলেন; অতঃপর তিনি তাকে উদ্দেশ্যে করে পরবর্তীতে বললেন: তুমি আস, অতঃপর আমার কানে চিমটি কাট।

কিন্তু গোলাম তাতে অপারগতা প্রকাশ করল; তখন তিনি তাকে পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন, তারপর সে হালকাভাবে কানে চিমটি কাটতে শুরু করল। তখন তিনি তাকে বললেন: ভাল করে চিমটি কাট; কেননা আমি কিয়ামতের দিনের শাস্তি ভোগ করতে পারব না। তখন গোলাম বলল: হে আমার মনিব! আপনি যেই দিনকে ভয় করেন, অনুরূপভাবে আমিও তো সেই দিনকে ভয় করি।

আবদুর রহমান ইবন ‘আউফ রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যখন তাঁর গোলামদের সাথে হাঁটতেন, তখন তাদের কেউ তাঁকে পৃথক কেউ ভাবতে পারতেন না। কেননা তিনি তাদের সামনে চলতেন

না এবং তারা যেই পোশাক পরিধান করত তিনিও সেই পোশাক পরিধান করতেন।

আর ওমর রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু কোন একদিন মক্কার পথ অতিক্রম করতেছিলেন, অতঃপর তিনি গোলামদেরকে তাদের মনিবদের সাথে না খেয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখলেন; তখন তিনি রাগ হয়ে তাদের অভিভাবকদেরকে বললেন: এই জাতির কী হল যে, তারা তাদের খাদেমদের উপর নিজেদেরকে প্রাধান্য দেয়? তারপর তিনি খাদেমদেরকে ডাকলেন, তারা তাদের সাথেই খাওয়া-দাওয়া করল।

আর জনৈক ব্যক্তি সালমান রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নিকট প্রবেশ করলে সে তাঁকে ময়দার খামির তৈরি করতে দেখল, তখন বলল: হে আবূ আব্দিল্লাহ! এ কী হচ্ছে? অতঃপর তিনি বললেন: আমরা খাদেমকে এক কাজে পাঠিয়েছি এবং আমরা তার উপর দু’টি কাজ এক সাথে চাপিয়ে দিতে অপছন্দ করলাম।

এটা হলো ইসলাম দাস-দাসীদেরকে যে অনুগ্রহ ও করুণা দেখিয়েছে তার কিছু নমুনা।

দাস-দাসীর ব্যাপারে ইয়াহূদীদের অবস্থান:

ইয়াহূদীদের নিকট মানুষ দুই ভাগে বিভক্ত: এক ভাগ হল ইসরাঈল সম্প্রদায়; আর অপর ভাগ হল বাকি সকল মানুষ।

আর ইসরাঈল সম্প্রদায়, তাদের বাইবেলের পুরাতন নিয়ম অনুসারে নির্ধারিত কিছু শিক্ষা সাপেক্ষে তাদের কাউকে দাস-দাসী বানানোর বৈধতা রয়েছে। আর তারা ব্যতীত অন্যরা হল নীচু বা অধঃপতিত জাতি, তাদেরকে বন্দী ও জোর-জবরদস্তী করে দাস-দাসী বানানো সম্ভব; কেননা তারা এমন বংশধর যাদের কপালে আদিকাল থেকে লাঞ্ছনা ও অপমান লিপিবদ্ধ

রয়ছে। তাওরাতরে প্রস্থান পর্বে (২১:২-১১) এসছে:

“যখন তুমি কোন ‘ইবরানী (হিব্রু জাতির) গোলাম ক্রয় করবে, তখন সে ছয় বছর খেদমত করবে এবং সপ্তম বছরে সে বিনা খরচে স্বাধীন হয়ে বেরিয়ে যাবে। সে যদি একা প্রবেশ করে, তবে সে একাই বের হয়ে যাবে; আর সে যদি কোন স্ত্রীর স্বামী হয়, তবে তার সাথে তার স্ত্রীও বের হয়ে যাবে; যদি তার মনিব তাকে কোন স্ত্রী দান করে এবং তার থেকে তার সন্তান-সন্ততি জন্ম হয়, তবে স্ত্রী ও তার সন্তানগুলো মনিবের হয়ে যাবে এবং সে একা বের হয়ে যাবে; কিন্তু গোলাম

যখন বলবে: আমি আমার মনিব, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদেরকে ভালবাসি, আমি তাদেরকে ছেড়ে স্বাধীন হয়ে বের হয়ে যাব না— তখন তার মনিব তাকে ঈশ্বরের নিকট পেশ করবে এবং সে দরজা বা দরজার চৌকাঠের কাছে তাকে নিয়ে তুরপুন দিয়ে তার কান ছিদ্র করে দেবে, তাতে সে সারা জীবন তার মালিকের গোলাম হয়ে থাকবে। আর যখন কোন ব্যক্তি তার কন্যাকে দাসী হিসেবে বিক্রয় করবে, তবে সে গোলামদের মত স্বাধীন হয়ে বের হতে পারবে না; কিন্তু যে মনিব তাকে নিজের জন্য পছন্দ করে নিয়েছে সে যদি তার উপর খুশী হতে না পারে তবে তাকে টাকার বদলে ছেড়ে দিতে হবে। অন্য

জাতির কোন লোকের কাছে তাকে বিক্রি করা চলবে না; কারণ তার প্রতি মনিব তার কর্তব্য করে নি। আর যদি মনিব তার ছেলের জন্য তাকে প্রস্তাব দিয়ে থাকে, তবে সে তার কন্যাদের অধিকার অনুযায়ী তার সাথে ব্যবহার করবে। যদি সে তার নিজের জন্য অন্য কোন দাসীকে গ্রহণ করে, তবে সে তার ভরণ-পোষণ ও আচার-ব্যবহারে কোনরূপ ঘাটতি করবে না। যদি সে তার সাথে এই তিন পদ্ধতির কোন এক পদ্ধতি অবলম্বন করতে ব্যর্থ হয়, তবে সে বিনামূল্যে কোন বিনিময় ছাড়াই তাকে চলে যেতে দিতে হবে।

যদি ‘ইবরানী (হিব্রু জাতি) ভিন্ন অন্যদেরকে দাস-দাসী বানানো হয় তবে তা হবে বন্দী করে ও জোর খাটিয়ে। কারণ, তারা বিশ্বাস করে যে, মর্যাদার দিক থেকে তাদের জাতি অন্যান্য জাতির চেয়ে অনেক উপরে। তারা দাসত্ব প্রতিষ্ঠার এই পদ্ধতির ব্যাপারে তাদের তাওরাত থেকে দলীল পেশ করে বলে: নূহের ছেলে হাম[১২] তার পিতাকে ক্রোধান্বিত করেছিল; কেননা নূহ কোন একদিন নেশা করেছিল, অতঃপর সে ঘুমন্ত অবস্থায় উলঙ্গ হয়ে গেল, অতঃপর হাম এই অবস্থায় তাকে দেখে ফেলল, অতঃপর ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে যখন নূহ এই ব্যাপারটি জানতে পারল, তখন সে রেগে

গেলে এবং তার বংশধরকে অভিশাপ দিলে যারা কেনানের বংশধর বলে পরিচিত। আর তিনি বলেন (যেমনটি তাওরাতের সৃষ্টি পর্বের ৯: ২৫-২৬ -এ উল্লেখ আছে): "'কানান অভিশপ্ত হোক! সে নিজের ভাইদের দাসানুদাস হবে।' আরও সে বলল: 'ধন্য হোক শেমের পরমেশ্বর! কানান তার দাস হোক!'" আর একই অধ্যায়ে বলা হয়েছে (৯:২৭) : "পরমেশ্বর যাফেথকে বিস্তৃত করুন, শেমের তাবুতে বাস করুক। আর কানান তার দাস হোক!"

বৃটেনের রাণী প্রথম এলিজাবেথে এই ভাষ্যের সূত্র ধরেই দাস-ব্যবসাকে বৈধ মনে করেন এবং এ ক্ষেত্রে অনেকে

‘অবদান’ রাখেন। বিষয়টি অচিরেই স্পষ্ট হবে।

দাস-দাসীর ব্যাপারে খ্রিষ্টানদের অবস্থান:

ইয়াহূদী ধর্মের পর খ্রিষ্টধর্মও দাসপ্রথাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ইঞ্জিলে (নতুন নিয়মে) একটি বক্তব্যও নেই যা দাসপ্রথাকে নিষিদ্ধ করে অথবা তার প্রতিবাদ করে।

অদ্ভুত বিষয় হল ঐতিহাসিক উইলিয়াম ম্যুর আমাদের নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই বলে দোষারোপ করে যে, তিনি তাৎক্ষণিকভাবে দাসপ্রথা বাতিল

করেন না; অথচ ঐতিহাসিক সাহেব দাসপ্রথার ব্যাপারে ইঞ্জিলের অবস্থান বেমালুম চেপে গেছেন। তিনি মাসীহ, হাওয়ারীগণ এবং গির্জা থেকে এই ব্যাপারে কোন কিছুই বর্ণনা করেন না।

বরং ‘পল’ তার পত্রসমূহে দাসদেরকে আন্তরিকতাসহকারে তাদের মনিবদের খেদমত ও সেবা করার নির্দেশ দিতেন, যেমন তিনি এফেসীয়দের নিকট প্রেরিত পত্রে বলেছেন।

আর সাধক ও দার্শনিক ‘থমাস অ্যাকুইনাস’ ধর্মীয় নেতাদের চিন্তাধারার সাথে দার্শনিক চিন্তাধারা একত্রিত করেছেন। তিনি দাসপ্রথার

প্রতিবাদ করেননি, বরং তিনি এর প্রশংসাই করেছেন। কারণ, তার গুরু এরিস্টটলের চিন্তাধারা অনুযায়ী দাসত্ব এমন এক স্বভাবগত অবস্থার নাম, যে প্রাকৃতিক স্বভাব দিয়ে কিছু মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

আর সাধকগণও স্বীকার করেছেন যে, প্রকৃতিই কিছু মানুষকে দাস-দাসী বানিয়েছে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বৃহৎ এনসাইক্লোপেডিয়া 'লারুস' –এ আছে: "খ্রিষ্টধর্মের অনুসারীদের মাঝে আজ পর্যন্ত দাসপ্রথা অবশিষ্ট ও চলমান থাকার কারণে মানুষ বিস্ময় প্রকাশ করে না। কারণ, আনুষ্ঠানিক ধর্মীয়

প্রতিনিধিগণ এই প্রথাকে বিশুদ্ধ বলে স্বীকৃতি প্রদান করেন এবং তা বিধিসম্মত বলে মেনে নেন।”

এতে আরও বলা হয়েছে: “সারকথা হল খ্রিষ্টধর্ম আজ পর্যন্ত দাসপ্রথাকে সন্তুষ্ট চিত্তে বিধিসম্মত মনে করে; আর মানুষের পক্ষে এ কথা প্রমাণ সম্ভব নয় যে, খ্রিষ্টধর্ম দাসপ্রথা বাতিল করার চেষ্টা করেছে।”

ডক্টর জর্জ ইউসুফের কামুস আল-কিতাব আল-মুকাদ্দাস (قاموس الكتاب المقدس) -এ এসেছে: “খ্রিষ্টধর্ম রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ কিংবা অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ কোনো দিক থেকেই দাসপ্রথার প্রতিবাদ করে নি;

তা বশি্বাসীদরেকে দাসত্ব সম্পর্কতি আচার-ব্যবহাররে ক্ষত্রে তাদরে প্রজন্মরে আচরণ পরতি্যাগ করতওে বলে না, এমনকি এই প্রসঙ্গে কোন আলোচনাও উৎসাহতি করে না। তা দাস মালকিদরে অধকিাররে বরিুদ্ধে কোন কথা বলে না; আর দাসদরে স্বাধীনতা অর্জনরে লক্ষ্যওে কোন আন্দোলন করায় না। তা দাসপ্রথার ক্ষতি ও নষ্ঠিুরতা সম্পর্কে কোন আলোচনা করে না; আর তাৎক্ষণকিভাবে দাসমুক্তরি নর্িদশেও দয়ে না। মোটকথা, তা দাস ও মনবিরে মধ্যকার আইনী সম্পর্করে কোন কছিুর পরবির্তন করে না; বরং এর বপিরীতে

তারা উভয় দলের অধিকার এবং দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে।”

আমরা হোয়াইট ফাদার্স সংগঠনের সকল খ্রিষ্টান ও সম্মানিত পাঠক সমাজকে আহ্বান করছি, তারা যেন ইসলামের শিক্ষা ও এই শিক্ষার মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা ও পর্যালোচনা করে দেখেন।

আধুনিক ইউরোপ ও দাসপ্রথা:

রেনেসাঁ ও প্রগতির যুগে অবস্থানকারী পাঠকের এই অধিকার আছে যে, এই যুগের প্রগতির অগ্রদূত (যেমন বলা হয়ে থাকে) সম্পর্কে জানতে চাইবে যে, দাসপ্রথার ব্যাপারে সে কী করেছে??

যখন ইউরোপের সাথে কৃষ্ণ আফ্রিকার যোগাযোগ হল, তখন এই যোগাযোগ ছিল মানবতার জন্য হৃদয়বিদারক ঘটনা, যার ফলে এই মহাদেশের কৃষ্ণাঙ্গরা দীর্ঘ পাঁচ শতাব্দী কাল ধরে ভয়াবহ বিপদ ও মুসিবতের সম্মুখীন হয়েছিল। ইউরোপের দেশগুলো সুসংগঠিত করেছে এবং তারা তাদেরকে তাদের নিজেদের দেশের সাথে টেনে নেয়ার ক্ষেত্রে তাদের নিকৃষ্ট চিন্তাধারা প্রকাশ করেছে, যাতে তারা তাদের জাগরণ ও রেনেসাঁর ইন্ধন হতে পারে এবং তারা নিজেরা যে কাজের সামর্থ্য রাখে না সে কাজের বোঝা তাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারে। পরবর্তীতে যখন

আমেরিকা আবিষ্কৃত হলো, তখন এক মহাদেশের পরিবর্তে দুই মহাদেশ সেবা করার বোঝা বহনের কারণে তাদের বিপদ ও মুসিবত আরও বেড়ে গেল।

এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটেনিকার ২য় খণ্ডের ৭৭৯ পৃষ্ঠায় SLAVERY শিরোনামে বলা হয়েছে: “জঙ্গল বেষ্টিত গ্রামসমূহ থেকে দাস-দাসী শিকারের কাজ সম্পন্ন হত ঐসব বিখণ্ডিত শুষ্ক উদ্ভিদে আগুন প্রজ্বলিত করার মাধ্যমে, যার থেকে গ্রামকে ঘিরে রাখার জন্য বেড়া বানানো হত। শেষপর্যন্ত যখন গ্রামবাসী নির্জন এলাকায় বের হয়ে যেত, তখন ইংরেজগণ তাদের জন্য তৈরি

করা ফাঁদের মাধ্যমে তাদেরকে শিকার করত।”

এই শিকার পদ্ধতির কারণে এবং ইংরেজ ও অন্যান্য কোম্পানির জাহাজ সমুদ্র তীরে নোঙ্গর করার পথে যারা মারা যেত, তারা ব্যতীত বাকি এক তৃতীয়াংশ মারা যেত আবহাওয়া পরিবর্তনের কারণে। আর ৪৫% মারা যেত জাহাজে বোঝাই করার সময়ে এবং ১২% মারা যেত সফরে। আর এ সংখ্যা হল তাদের উপনিবেশে যারা মারা যেত, তাদের অতিরিক্ত ...

আর বৃটেন সরকার কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স নিয়ে এই দাসব্যবসা কিছু ইংরেজ কোম্পানির একচ্ছত্র

আধিপত্য থাকে। পরবর্তীতে ব্রিটেনের সব প্রজাদের হাতে দাসব্যবসা করার অধিকার প্রদান করা হয়। ১৬৮০-১৭৮৬ খ্রিষ্টাব্দ সময়কালে ব্রিটিশ অধিকৃত ও বিভিন্ন উপনিবেশে দাস হিসেবে নিয়োগকৃত ব্যক্তিদের সংখ্যা কোনো কোনো বিশেষজ্ঞের মতানুসারে ২১৩০০০০ (একুশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) ছিল।

আর এই ব্যাপারে তাদের কালো আইনগুলোর অন্যতম হল: যে দাস তার মনিবের উপর আক্রমণ করে, তাকে হত্যা করা হবে। আর যে পালিয়ে যাবে, তার দুই হাত ও দুই পা কেটে ফেলা হবে এবং তাকে উত্তপ্ত লোহা দ্বারা সেকে

দেয়া হবে; আর যখন সে দ্বিতীয়বারের মত পলায়ন করবে, তখন হত্যা করা হবে।

আমার জানা নেই যে, হাত-পা কেটে ফেলার মত শাস্তি দেয়ার পরেও দ্বিতীয় বার কিভাবে সে পলায়ন করবে?? সম্ভবত সে যে-নরকে বাস করত, তা তার হাত-পা কাটার চাইতেও আরও ভয়াবহ ছিল, যার ফলে সে দ্বিতীয়বার পালানোর চেষ্টা করত।

আর তাদের আইনগুলোর মধ্যে আরেকটি হল: কৃষ্ণাঙ্গদের শিক্ষা গ্রহণ নিষিদ্ধ; আর কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য শ্বেতাঙ্গদের চাকুরি নিষিদ্ধ।

আমেরিকার আইন-কানুনসমূহের মধ্যে আছে: যখন সাতজন দাস এক জায়গায় একত্রিত হবে, তখন তা অপরাধ বলে বিবেচিত হবে এবং শ্বেতাঙ্গরা যখন তাদের পাশ দিয়ে পথ অতিক্রম করবে, তখন তাদের জন্য তাদেরকে থুথু দেয়া ও বিশটি করে বেত্রাঘাত করা বৈধ হবে।

আর অপর একটি আইনের ভাষ্য হল: দাসদের আত্মা বা রূহ বলতে কিছু নেই, তাদের নেই মেধা, বিচক্ষণতা ও ইচ্ছাশক্তি; আর তাদের জীবনের অস্তিত্ব শুধু তাদের বাহুতেই আছে।

এই ব্যাপারে সারকথা হল, দাস-দাসীগণ দায়িত্ব-কর্তব্য, সেবা ও ব্যবহারের

দৃষ্টিকোণ থেকে বুদ্ধিমান ও জবাবদিহিতার অধীন, কোন কিছুর ঘাটতি হলেই তাকে শাস্তির মুখোমুখি হতে হবে। কিন্তু অধিকারের বেলায় সে হল এমন বস্তুর নাম, যার কোন প্রাণ ও অস্তিত্ব নেই; বরং আছে তার শুধু দুই বাহু বা হাত!

এভাবেই তাদের হৃদয় এই শেষে শতাব্দীতে এসে কিছুটা সঠিক উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছে। আর যে কোন ন্যায়পরায়ণ লোক এর মধ্যে ও মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চৌদ্দ শতাব্দী কালেরও বেশি সময় ধরে চলমান ধর্মীয় শিক্ষার মধ্যে তুলনামূলক

পর্যালোচনা করবে, সে উপলব্ধি করতে পারবে যে, এ বিষয়টিতে ইসলামকে ঢুকানোর চেষ্টার ক্ষেত্রে বহুল প্রচলিত সে উপমাটি অধিকতর প্রযোজ্য: “নিজের দোষ আমার উপর চাপিয়ে দিয়ে সরে পড়ল!”

*****

নারী

দাসপ্রথার ব্যাপারে যা বলা হয়েছে, নারীদের ব্যাপারেও তাই বলা যায়। কারণ, ইয়াহূদী এবং খ্রিষ্ট ধর্মের অনুসারীদের পক্ষ থেকে নারীদের নিয়ে কোনো আলোচনা করার অধিকার নেই; কেননা তাদের ধর্মে নারী

অধিকারের প্রসঙ্গে যে বক্তব্য রয়েছে, তা খুবই মন্দ জিনিস। তারা নারীর অধিকারসমূহকে আত্মসাৎ করেছে এবং তারা তাকে পৃথিবীর মধ্যে সকল অন্যায় ও অপরাধের উৎস বলে বিবেচনা করেছে; আর মালিকানা ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে তার অধিকার হরণ করেছে। একজন নারী তাদের মাঝে বসবাস করে অপমান, তুচ্ছ ও নাজেহাল অবস্থার মধ্যে; আর তারা তাকে অপবিত্র সৃষ্টি মনে করে।

আর তাদের নিকট বিয়ে-শাদী মূলত একটা ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি, যে ব্যবস্থাপনায় নারী তার স্বামীর অন্যান্য মালিকানাধীন বস্তুর মত

একটা সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এমনকি তাদের কোন কোন সম্মেলনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল নারী ও তার রূহ বা আত্মাকে নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য— সে কি মনুষ্যজাতির অন্তর্ভুক্ত, নাকি না?!

বরং হয়ত নিজেদেরকে আসমানী শিক্ষার সাথে সম্পৃক্তকারী (নাউযুবিল্লাহ) এই ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের তুলনায় প্রথম দিকের জাহেলী আরবগণ অন্যায়ভাবে নারীদের উপর অনেক কম বলপ্রয়োগ ও নিপীড়ন করেছে।

আর সে জন্যেই খ্রিষ্টানদের ব্যাপারে আমাদের কৌতুহল মাথাচাড়া দিয়ে উঠে; কিভাবে তারা ইসলামী শরী‘আত ও

সমাজ ব্যবস্থায় নারীদের অবস্থান নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করে?!

কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও তার চোখ ধাঁধানো যেসব চাকচিক্য ও চমক রয়েছে, সে ব্যাপারে ইয়াহূদী ও খৃষ্টানদের কোন ভূমিকা নেই[১৩]।

তা সত্ত্বেও আমরা মুসলিমগণ এসব হৈ-চৈ সৃষ্টিকারী [পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারী] দের পিছনে চলি না এবং [পাশ্চাত্যের] আধুনিক নারীসমাজ যে পদ্ধতির উপর প্রতিষ্ঠিত আমরা তা সমর্থন করি না।

আমাদের দ্বীনে নারীগণ আমাদের মা, বোন ও কন্যা হিসেবে সম্মান ও

মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত। আর আমাদের নিকট নারীদের অবস্থান ও মর্যাদা বর্ণনায় অনেক বিশুদ্ধ ও সুস্পষ্ট ধর্মীয় বক্তব্য রয়েছে, যেগুলোর সুস্পষ্ট আগমন হয়েছে আজ থেকে চৌদ্দশত বছরেরও অধিক সময় পূর্বে, যখন সারা দুনিয়া পূর্ব ও পশ্চিম জুড়ে জাহেলিয়াতের অন্ধকারে ডুবে ছিল; নারীর অধিকার ছিল খুবই নগণ্য; বরং তার কোন অধিকারই স্বীকৃত ছিল না।

আর এসব প্রশ্নের জবাবের ভূমিকায় আমি যা বলেছি, এখানে সেটারই তাগিদ দিয়ে বলছি যে, “আমরা কোন নমুনা বা আদর্শের উপর ঐক্যমত পোষণ করব[১৪]?”

ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের ধর্মে যা আছে, তা সর্বজনবিদিত এবং তা সকলের নিকট অপছন্দনীয়; কারণ, [নারীদের ব্যাপারে] যে সকল প্রশ্ন এখানে করা হয়েছে উভয় ধর্মেই এসব উত্থাপিত প্রশ্নের কোন জবাব নেই।

আর আধুনিক সভ্যতা, তার মাঝে বিশেষ করে নারী সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বহু মন্দ দিক রয়েছে, আমাদের দ্বীনে সেই [মন্দ দিক] নেই। আর এতে যেসব ভাল দিক রয়েছে, আমাদের দ্বীন তার বিরোধিতা করে না।

বিষয়টি অধিক সুস্পষ্ট করার জন্যই আমরা শিক্ষার ময়দানেই একবার ঢুঁ মেরে দেখি।

যার দ্বারা এই সভ্যতা স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়েছে, তার অনেকাংশেই হল জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিক্ষা ও এর দিকে আহ্বানের প্রতি গুরুত্বারোপ করা এবং এর জন্য অধিকহারে বিভিন্ন কর্মসূচী ও উপায়-উপকরণ গ্রহণ করা; আর তা সর্বজনবিদিত। আর আমরাও পরিষ্কারভাবে বলি যে, আমাদের ধর্মে বিদ্যা অর্জন একটি প্রশংসনীয় উদ্যোগ; বরং তার কোন কোন দিক বাধ্যতামূলক ফরয, যা পরিত্যাগকারী অপরাধী বলে বিবেচিত হবে, চাই সে পুরুষ হউক অথবা নারী।

সমতার ব্যাপারে আমরা যে আলোচনা করছি, সে দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যেক শ্রেণীর যে দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারিত হয়েছে, সে অনুযায়ী শিক্ষার ক্ষেত্রে নারী পুরুষের মতোই। কিন্তু আমাদের তো প্রশ্ন করার অধিকার আছে যে, শিক্ষার সাথে উন্মুক্ত রূপচর্চা, সৌন্দর্য প্রকাশ, আকর্ষণীয় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকাশ এবং বক্ষ ও উরু উন্মুক্ত করার কী সম্পর্ক রয়েছে? আঁটসাঁট, খাট ও শরীর দেখা যায় এমন পাতলা পোশাক পরিধান করাটা কি শিক্ষার কোন উপকরণের আওতায় পড়ে?

অন্যদিকে: এটা কোন্ ধরনের সম্মান ও মর্যাদার বিষয়, যখন বিজ্ঞাপন, প্রচারমাধ্যম এবং প্রত্যেক ক্ষেত্রেই নারী দেহের সৌন্দর্যের ছবি দেওয়া হয়? তাদের নিকট শুধু সৌন্দর্যের বাজার গরম; যখন তার সৌন্দর্য ও সাজসজ্জার বয়স শেষ হয়ে যায়— যেভাবে কোন যন্ত্রের কার্যক্ষমতা শেষ হলে তা পরিত্যক্ত করা হয়, তখন তাকে এমনভাবেই ফেলে দেওয়া হয়।

এই সভ্যতার মধ্যে কম-সুন্দরীর ভাগ্য কী? আর কীই বা আছে ভাগ্যে বয়স্কা মাতা ও বৃদ্ধা দাদী-নানীর? তার আশ্রয়স্থল তো বৃদ্ধাশ্রম, যেখানে

তার সাথে কেউ দেখা-সাক্ষাত করে না এবং জিজ্ঞাসা করা হয় না তার কোন খোঁজখবর। হয়তো তার ভাগ্যে জুটে কিছু অবসরভাতা কিংবা সামাজিক বীমা বা নিরাপত্তামূলক ভাতা, যার থেকে সে মৃত্যু পর্যন্ত আহার করে। সেখানে নেই কোন আত্মীয়তা, নেই সৌহার্দ্য বা অন্তরঙ্গ বন্ধু।

অথচ ইসলামে নারীর অবস্থা হল, যখন তার বয়স বেড়ে যাবে, তখন তার সম্মান বৃদ্ধি পাবে এবং তার অধিকার আরও বড় হবে। অর্থাৎ, সে তার উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে; আর পুত্র, নাতী, তার পরিবার-পরিজন ও সমাজের নিকট তার অধিকার অবশিষ্ট রয়েছে।

সম্পদ, মালিকানা, দায়িত্বের ক্ষেত্রে এবং ইহকালীন ও পরকালীন পুরস্কার বা সওয়াব ও শাস্তির ব্যাপারে নারী ও পুরুষের অধিকার সমান। তবে শরী‘আতের কিছু কিছু বিধিবিধানের ক্ষেত্রে পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে ভিন্নতা রয়েছে তা প্রাকৃতিকভাবেই স্বীকৃত, যে ব্যাপারে আমরা সমানাধিকার প্রসঙ্গে আলোচনার মধ্যে বিস্তারিত বলেছি। তবে আমরা এখানে উত্তরাধিকার, অসিয়ত (Will) ইত্যাদি বিষয়ে উত্থাপিত কিছু প্রশ্ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব।

উত্তরাধিকার (الميراث):

উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে পুরুষের অংশ নারীর অংশ থেকে ভিন্ন; আর তার কয়েকটি কারণ রয়েছে:

১. উত্তরাধিকারের বিষয়টি ইসলামের সাধারণ নিয়ম-কানুনের অন্যতম একটি দিক; সুতরাং তা পুরুষ ও নারীর সাথে সম্পৃক্ত সার্বিক দায়দায়িত্ব ও বিধিবিধানেরই অনুগামী। এ বিধিবিধানে যে ভিন্নতা রয়েছে তার কারণ এই সাধারণ বিধান যে, সব ধরনের কর্মীদের মধ্যে সমতা ও সাম্য প্রতিষ্ঠার অগ্রহনযোগ্য। বরং তাদের জন্য অংশ বরাদ্দ হবে তাদের কর্মকাণ্ড ও দায়দায়িত্ব অনুযায়ী। তাই পুরুষগণ যদিও এক জাত, কিন্তু

সরকারী ও বেসরকারী সকল আইন ও বিধানেই তাদের সবার বেতন ও পদ সমান হয় না। এই ধরনের ব্যবধান তৈরি হয় তাদের কর্মকাণ্ডের ধরন, তাদের যোগ্যতা ও দক্ষতার উপর ভিত্তি করে। আর এইভাবে ছাড়া জীবনও চলতে পারে না; সমতা বা সমানাধিকারের নীতিতে এই ধরনের ব্যবধানের কোনো প্রভাবও বিবেচনা করা হয় না।

২. ইসলামী বিধানে পুরুষের উপর আরোপিত দায়-দায়িত্বের প্রকৃতির উপর ভিত্তি করেই পুরুষের অংশ বেশি। কেননা, পুরুষকেই মোহর, [স্ত্রীর] থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাসহ বিয়ের সকল

ব্যয়ভার ও দায়িত্ব একাই বহন করতে হয়।

এই বিধানকে আরও ব্যাখ্যা করি: ধরে নিই যে, কোন ব্যক্তি মারা গেল এবং রেখে গেল এক ছেলে ও এক মেয়ে; এমতাবস্থায় ছেলে তার বোনের দ্বিগুণ অংশ পেয়েছিল। অতঃপর তাদের প্রত্যেকেই নিজ নিজ অংশ গ্রহণ করল এবং উভয়ে বিয়ে করল। এ ক্ষেত্রে ছেলে সারা জীবন তার স্ত্রীর মোহর ও থাকা-খাওয়াসহ যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করতে দায়বদ্ধ; অথচ তার বোনের বিয়ে হলে সে তার স্বামী থেকেও মোহর গ্রহণ করবে; কিন্তু তার বিয়েতে কিংবা তার সাংসারিক

খরচেরে জন্য তার অংশ থেকে কোন কিছুই ব্যয় করার প্রয়োজন হবে না।

একইভাবে ভুলজনিত হত্যার রক্তপণ পরিশোধে হত্যাকারীকে সহযোগিতার দায়িত্ব গ্রহণ করেনে নিজ গোষ্ঠী ও আত্মীয়-স্বজনেরে পুরুষ ব্যক্তিগণ, নারীরা নয়।

এর থেকেই সুস্পষ্ট হয় যে, ইসলামী বিধি-বিধানে পুরুষগণকে কি পরিমাণ অর্থনৈতিক ব্যয়ভার বহন করতে হয়, যা নারীদেরকে বহন করতে হয় না। আর এ জন্য আমাদেরে জেনে রাখা আবশ্যক যে, ইসলামী শরী‘আত মানুষের মনগড়া ঐ অত্যাচারী শাসনতন্ত্র ও ও মতবাদ থেকে ভিন্ন, যা আজকেরে বিশ্বেরে

অনেক ভূখণ্ডকে শাসন করছে; যেখানে পিতা তার কন্যার বয়স আঠারোতে পৌঁছলে তার ব্যাপারে দায়মুক্ত হয়ে যায় ও সম্পর্ক ছিন্ন করে, ফলে সেই কন্যা নিজের জীবন-জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে পড়ে; অনেক ক্ষেত্রে তা তার ইয্যত ও সচ্চরিত্র বাবদ হয়ে থাকে।

কিন্তু ইসলামে, কন্যা বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তার পিতা অথবা শরীয়ত অনুযায়ী পিতার স্থলাভিষিক্ত অভিভাবকের তত্ত্বাবধানে থাকবে।

বিধিবিধান ও নৈতিকতার উপর ভিত্তি করে ইসলামের বিধানে বেঁচে থাকার নিশ্চয়তা সম্মান ও ইয্যতের বিনিময়ে হয় না। কেননা, ইয্যত ও মর্যাদা

বিনষ্ট হওয়া মানে গোটা দুনিয়া ধ্বংস হয়ে যাওয়া। যুবক ও যুবতীরা তাদের যৌবনের বেপরোয়া চালচলনের সময়কালে সাময়িক স্বাদ গ্রহণ করে, কিন্তু তার পরিণাম তো ধ্বংস, পারিবারিক ভাঙ্গন, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ার মত বিপর্যয়। ইউরোপ ও ইউরোপের অনুসারী দেশগুলোর পথ-নারী এবং ম্যাগাজিন ও ফিল্মের তরুণী— সব তো এই ধ্বংসাত্মক নিয়মের কুফল।

৩. উত্তরাধিকারের মধ্যে লক্ষণীয় বিষয় হল বস্তুগত দিক। কারণ, তা বিবাহ ব্যবস্থাপনার উপর ভিত্তি করে

গড়ে উঠেছে। এটা যেন একটা বিশুদ্ধ ফলাফল বের করার জন্য যোগের পর বিয়োগের কাজ। অর্থাৎ: উত্তরাধিকারের মধ্যে বৃদ্ধিটুকু প্রাধান্য দেওয়ার বিষয় নয়; বরং তা হল নিরেট বস্তুগত প্রতিদান।

আর মুসলিম নারীর অমুসলিমের সাথে বিয়ে-শাদীর অধিকার নিয়ে করা প্রশ্ন সম্বন্ধে কথা হল, এটা ইসলামী শরী‘আতের সামগ্রিক নিয়ম-নীতিরই অন্তর্ভুক্ত। আর আমরা যেমনটি সমানাধিকার প্রসঙ্গে আমাদের দেয়া জবাবে ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত আলোচনা করে বলছিলাম যে, জাতীয় স্বার্থের কথা বিবেচনা করে সমাজের

সামরিক ব্যক্তিবর্গ ও কূটনৈতিক ব্যক্তিবর্গের মতো কোন কোন গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর সাথে বিয়ে-শাদী করতে বাধা প্রদান করা হয়। দুনিয়ার এই নিয়মে কিছু বৈষম্য আছে, যাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই এবং তা সমানাধিকারের সাধারণ নীতিকেও লঙ্ঘন করে না।

তালাক:

বর্তমান যুগে এমন কেউ নেই, যে তালাকের কার্যকারিতার ব্যাপারে বিতর্ক করে। যখন স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সংশোধন, সংস্কার ও সমন্বয় করার জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টার পরেও তাদের পক্ষে একই ছাদের নীচে

জীবনযাপন করা অসম্ভব হয়ে পড়ে—তখন এ বিধানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

আর ইসলাম গৌরব ও মহত্বের দাবিদার যে, তা তালাককে বিধিবিদ্ধ করেছে এবং তার বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছে; আর পৃথক পৃথকভাবে প্রদত্ত তিন তালাকের মাঝে স্ত্রীকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার সুযোগ করে দিয়েছে; শরী‘আতের বিধানাবলিতে বর্ণিত হিসাব অনুযায়ী (তিন তালাকের) প্রত্যেক তালাকের মাঝে একটা নির্দিষ্ট সময়কাল ইদ্দত নির্ধারিত করেছে। মানবরচিত সব বিধান মানুষের

স্বভাব, স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্ক, পারিবাকিভাবে জীবনযাপন ও সামাজিক বন্ধনের প্রতি লক্ষ্য করে ইসলামের মতো প্রজ্ঞাপূর্ণ বিধান নিয়ে আসতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

আর আধুনিক সভ্যতার প্রত্যেকে আইন-ই তালাকের কথা বলে এবং তালাকের বিধান গ্রহণ করে বিকৃত খ্রিষ্টাধর্ম বিধান সত্ত্বেও। খ্রিষ্টধর্মের মতে, বিয়ে এমন এক বন্ধন, যা আকাশে সম্পন্ন হয়। সে বন্ধনকে আকাশেই শুধু বিচ্ছিন্ন করা যাবে।

আমরা অস্বীকার করি না যে, কোন কোন স্বামী তালাকের প্রয়োগে ভুল করে থাকে; বিশেষ করে যেখানে অজ্ঞতা ও নিরক্ষরতাপ্রধান সমাজগুলোতে। প্রয়োগের ক্ষেত্রে ঘটিত ভুলের দায়ভার মূল নিয়ম ও বিধানের উপর চাপিয়ে দেয়াটা অগ্রহণযোগ্য। আপনি লক্ষ্য করে থাকবেন যে, দুনিয়ায় এমন লোকও আছে, যাকে ডাক্তার নির্দিষ্ট পরিমাণ ঔষধ নির্দিষ্ট সময়ে সেবন করার জন্য বলে দেয়; কিন্তু সেই রোগী ব্যবস্থাপত্রের বিপরীত কাজ করে এবং ভুল করে; তখন কিন্তু তার দায়ভার সম্পূর্ণভাবে রোগীর উপরই

বর্তায়, যদি সে রোগী বিবেকবান ও জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন হয়।

তবে প্রশ্নপত্রে যে কথা বলা হয়েছে যে, স্বামী তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে কোনো যথাযথ কারণ প্রদর্শন এবং ফলাফল ভোগ ব্যতীত— এ কথাটি সঠিক নয় এবং তা ইসলাম ও তার বিধিবিধানের কোথাও নেই। বরং স্ত্রী যখন তার স্বামীর নিকট থেকে দুর্ব্যবহার অথবা উপেক্ষার শিকার হয়, তবে সে তার স্বামীর সাথে সরাসরি প্রতিকারের ব্যবস্থা করবে সন্ধির মাধ্যমে কিংবা দাম্পত্য জীবন ও সংসার বহাল রাখতে সহায়ক যেকোনো পদ্ধতিতে। যখন

স্ত্রী এরূপ কোনো পথ খুঁজে না পাবে, তখন সে বিচারের আশ্রয় নেবে; বিচারকের নিকট যদি স্ত্রীর পক্ষে সত্য বলে প্রমাণিত হয়, তবে তিনি বিয়ে ভেঙ্গে দেয়ার এবং স্বামী ও স্ত্রীর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার হুকুম দেবেন, যদিও স্বামী তাতে রাজি না হয়।

শিশুর অভিভাবকত্ব:

প্রশ্নের মধ্যে যে বিবরণ রয়েছে, তন্মধ্যে একটি কথা হল: ‘সন্তানদের অভিভাবকত্বের ও লালন-পালনের অধিকার শুধু পিতার জন্যই নির্ধারিত, যদিও শিশুরা মায়ের পরিচর্যায় থাকে।’

এমন বক্তব্য সঠিক নয় এবং এটা শরী‘আতের বিধানের অন্তর্ভুক্তও নয়। আর এর দু’টি মৌলিক কারণ রয়েছে:

প্রথমত:

আল-কুরআনুল কারীম ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাহর মধ্যে এমন কোন সাধারণ বক্তব্য নেই, যা পিতা-মাতাদের দু’জনের একজনকে সবসময় অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলে; আবার এমন কোন বক্তব্যও নেই, যা সবসময়ে পিতা-মাতাদের দু’জনের একজনকে পছন্দ করার কথা বলে।

দ্বিতীয়ত:

আলেম সমাজ এই ব্যাপারে একমত যে, চূড়ান্তভাবে পিতা-মাতা দু’জনের একজন নির্ধারিত নয়।

আর এর ফলেই এ বিষয়ে ফিকহী মাযহাবসমূহের মধ্যে মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই মতপার্থক্যের ভিত্তি হল শিশুর স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, শিশুপালন ও অভিভাবকত্বের দায়িত্বের জন্য পিতা বা মাতার উপযুক্ততা এবং এই দায়িত্ব পালনে তাদের সামর্থ্য।

আর তারা এই ব্যাপারে একমত যে, যদি তাদের কোনো একজন এই দায়িত্বের

অনুপযুক্ত হয়, তবে তার জন্য শিশুপালন অথবা অভিভাবকত্বের দায়িত্বগ্রহণ বৈধ নয়।

একাধিক স্ত্রী:

প্রশ্নগুলোতে এসেছে যে, ‘বাহ্যিকরূপে দেখা যাচ্ছে একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতার দ্বারা এক শ্রেণীর মানুষকে অপর শ্রেণীর উপর স্থান দেয়া হয়েছে।’

মূলত: [ইসলামী শরী‘আতের] এ অবস্থানের ব্যাখ্যার দু’টি দিক রয়েছে:

প্রথমত:

পুরুষ ও নারী হিসেবে মানব জাতির ভিন্নতার উপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত হয়েছে তার স্বভাব-প্রকৃতি ও সামর্থ্যের ক্ষেত্রে ভিন্নতা; আর এই যে ভিন্নতা যাকে কেউ অস্বীকার করে না, সেটাকে এক শ্রেণীর মানুষকে অপর শ্রেণীর উপর স্থান দেয়ার ব্যাপারে দলিল হিসেবে গ্রহণ করা ঠিক নয়; যেমন আমরা তা সমানাধিকার নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি।

দ্বিতীয়ত:

ইসলামী শরী‘আত একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে বৈধ করে দিয়েছে; কারণ, এটা শরী‘আতের সামগ্রিক শিক্ষার

সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং অনুরূপভাবে তা পুরুষ ও নারী সকল মানুষের স্বভাব-প্রকৃতির সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ।

আর একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করার বিষয়টি শরী‘আতের ব্যাপক শিক্ষার সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। কেননা শরী‘আত যিনা-ব্যভিচারকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং তা নিষিদ্ধ করার ব্যাপারে কঠোরতা আরোপ করেছে; অতঃপর অন্যভাবে খুলে দিয়েছে একটি শরী‘আত সম্মত দরজা; আর তা হল বিয়ে এবং শরী‘আত একাধিক বিয়েকে বৈধ করে দিয়েছে। আর তাতে সন্দেহ নেই যে, একাধিক স্ত্রী গ্রহণ থেকে নিষেধ করা হলে, তা যিনা-ব্যভিচারের দিকে

নিয়ে যাবে। কারণ, নারীদের সংখ্যা পুরুষদের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে যাবে এবং যখনই যুদ্ধ সংঘটিত হবে, তখন ব্যবধান বাড়তে থাকবে। আর আমাদের বর্তমান সময়ে বহু ধরনের অস্ত্র দেখা যায়, যার একবারের আক্রমনে অথবা কামানের একটি গোলা বর্ষণের দ্বারা শত শত যোদ্ধার প্রাণহানি ঘটে, বরং এর দ্বারা কোন কোন ক্ষেত্রে আর কোন যোদ্ধাই অবশিষ্ট থাকে না; ফলে একজন নারীর বিয়ের পথ সংকুচিত হয়ে যায় এবং এতে নারীদের একটি বিরাট অংশ অবিবাহিত অবস্থায় থেকে যায়। আর নারী বিবাহ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং অবিবাহিত অবস্থায় জীবনযাপন করার দ্বারা

মানসিক সংকীর্ণতা, মান-সম্মান বিক্রয়, যিনা-ব্যভিচারের ব্যাপক ছড়াছড়ি ও বংশধর বিনষ্ট হওয়ার মত বড় ধরনের নেতিবাচক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

অপরদিকে মেলামেশার ক্ষেত্রে প্রস্তুতির দৃষ্টিকোণ থেকে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভিন্নতা রয়েছে। কারণ, নারী যৌন চাহিদা পূরণার্থে সব সময় মেলামেশার জন্য প্রস্তুত নয়; কেননা মাসিক পিরিয়ড অবস্থায় এ ক্ষেত্রে প্রতি মাসে তার দশ দিন অথবা দুই সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং নিফাস অবস্থায় প্রতিবন্ধকতার সময়কাল যা বেশিরভাগ সময়ে চল্লিশ

দিন পর্যন্ত গড়ায়; আর এই দুই সময়ের মধ্যে উভয়ের মেলামেশা শরী‘আতের বিধান অনুযায়ী নিষিদ্ধ। আর গর্ভকালীন অবস্থায় এই [মেলামেশার] ব্যাপারে প্রস্তুতি নেয়াটা নারীর জন্য খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার। আর পুরুষের প্রস্তুতি থাকে মাস ও বছরব্যাপী একই রকম। সুতরাং পুরুষ ব্যক্তিকে যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণে বাধা প্রদান করা হবে, তখন সে এই ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় যিনা-ব্যভিচারের আশ্রয় গ্রহণ করবে।

পূর্বের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হয়েছে যে, শরী‘আত স্বভাব-চরিত্রের যথাযথ মূল্যায়ণ করেছে, স্থান কাল পাত্রভেদে

পুরুষের সংখ্যার ঘাটতি হয়, নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় এবং সেসব পরিবেশ-পরিস্থিতির প্রতিও দৃষ্টি দিয়েছে যা নারীর উপর আপতিত হয়; ফলে সে [স্বামীর আহ্বানের জন্য] প্রস্তুত থাকে না এবং স্বামীর আহ্বানে পূর্ণাঙ্গ সাড়া দিতে পারে না।

বিয়ের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে অপর আরেকটি উদ্দেশ্য হল, মানব প্রজন্মকে রক্ষা করা, মানুষের বংশবিস্তার অব্যাহত রাখা এবং স্থায়ী পরিবার কাঠামো গঠন করা; সুতরাং যখন সে কোন বন্ধ্যা নারীকে বিয়ে করে এবং তার জন্য অপর কোন নারীকে বিয়ে করা বৈধ না হয়, তবে

বিয়ের উদ্দেশ্য হাসিল করা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে; আর যখন বিষয়টি এমন হয় যে, তার প্রথম স্ত্রী তার সাথে বহাল তবিয়তে বিদ্যমান থাকবে এবং তার জন্য অপর নারীকে বিয়ের অনুমতি দেয়া হয় যাতে সে সন্তান লাভের আশায় তাকে বিয়ে করতে পারে, তবে তাকে তালাক দেয়ার চেয়ে তা অবশ্যই উত্তম হবে।

অতঃপর পুরুষের সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা নারীর ক্ষমতার চেয়ে অনেক বেশি। কারণ, পুরুষ ষাট বছর বয়সের পরেও সন্তান জন্ম দিতে সক্ষম; আর নারীর বয়স চল্লিশের সীমানায় পৌঁছলেই সন্তান জন্ম দেয়ার ক্ষমতা

লোপ পায়। সুতরাং একাধিক স্ত্রী গ্রহণে যদি পুরুষের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়, তাহলে তার অর্ধেক বয়সেরও বেশি সময় ধরে বংশবিস্তারের কার্যক্রম বন্ধ থাকবে।

এটাই হচ্ছে শরী‘আত কর্তৃক একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বৈধতা দানের অন্যতম প্রধান দৃষ্টিভঙ্গি ও সূক্ষ্ম দর্শন; এটাকে অনুমোদন দেয়া হয়েছে সম্ভাব্য ক্ষতি ও সংকট দূর করার জন্য এবং নারীদের মাঝে সমতা বিধান ও চরিত্রকে সমুন্নত করার জন্য।

আর আমরা শরী‘আতের অনুসারীগণ অবগত আছি যে, ইউরোপীয়গণ রচিত নিয়ম-কানুন এই ব্যবস্থার (একাধিক

স্ত্রী গ্রহণের) স্বীকৃতি দিয়েনি; বরং তারা এটাকে কৌতুহল ও ঘৃণার বিষয় এবং ইসলামের উপর অপবাদের ক্ষেত্র বানিয়েছে।

কিন্তু আমরা তাদের চিন্তাবিদ ও সংস্কারপন্থী প্রচারকগণের মনে তার কিছু দিক গ্রহণের ব্যাপারটি অনুভব করতে শুরু করেছে; বিশেষ করে বিধ্বংসী যুদ্ধ, নারীদের একটা বড় ধরনের সংখ্যা বিধবা হওয়া এবং পুরুষদের চেয়ে নারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার সাথে সাথে তাদের টনক নড়তে শুরু করেছে।

আর তাদের মধ্যে প্রেমিকা বা বান্ধবী গ্রহণের ছড়াছড়িই তাদের ব্যাপারে আমাদের জন্য দলিল-প্রমাণ হিসেবে

যথেষ্ট; কেননা একজন পুরুষের জন্য একাধিক অন্তরঙ্গ বান্ধবী থাকে, যারা তার স্ত্রীর সাথে তার পুরুষত্ব, ভালবাসা ও সম্পদের অংশ ভোগ করে; বরং কোন কোন সময় তাদের কেউ কেউ তার এই সকল ক্ষেত্রে স্ত্রীর অংশের চেয়েও বেশি অংশ ভোগ করে।

এর সাথে আরও সংযুক্ত হল যিনা-ব্যভিচারের বিস্তার, তার উপর ভিত্তি করে সৃষ্ট রোগ-ব্যাধি, অধিক পরিমাণে জারজ সন্তানের জন্ম এবং মায়েদের পেটের মধ্যস্থিত ভ্রূণ হত্যা।

বরং তারা তাদের জাতিগত সম্পর্কের ভিত্তি স্থাপন করছে এক ভয়াবহ বিশৃঙ্খলার উপর; সুতরাং জারজ সন্তান

ও অশ্লীলতার ফলে নিক্ষিপ্ত রাস্তায় পড়ে থাকা সন্তান কোন কোন দেশে বৈধ সন্তানদের সমপরিমান হয়ে গিয়েছে।

আর যে সময়ে তারা একাধিক স্ত্রী গ্রহণের বিষয়টিকে নিয়ে উচ্চবাচ্য করে, ঠিক সে মুহূর্তে তাদের পুরুষ ব্যক্তিগণ কর্তৃক হরেক রকম নারীর নিকট আসা-যাওয়া করাটা তাদের নিকৃষ্ট রুচিতে একটা সর্বজনবিদিত গ্রহণযোগ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট কেনেডির স্ত্রী উল্লেখ করেছেন যে, তার স্বামীর ২০০ থেকে ৩০০ বান্ধবী ছিল।

আর তাদের দরিদ্র শ্রেণীর লোকেরা প্রত্যেকেই একশত নারীর উপর দখলদারিত্ব করার ক্ষমতা রাখে; সুতরাং তাদের উঁচু শ্রেণীর লোকদের অবস্থা কি হতে পারে!।

আর তাদের নিকট একজন পুরুষ নির্দ্বিধায় প্রেমিকাদের একটা বাহিনীর মাঝে আসা-যাওয়া করতে পারে; পক্ষান্তরে যখন সে বিষয়টি মজবুত চরিত্র ও সুন্দর জীবন-যাপন প্রণালীর মাধ্যমে কয়েকজন স্ত্রীর মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, তখন তাদের দৃষ্টিতে সেটা হয়ে দাঁড়ায় মারাত্মক অপবাদ, বরং হারাম কাজ!!!

‘জর্জ কালমানসু’ তার সময়কার
(১৮৪১ - ১৯৩৯ খ্রি.)
ফ্রান্সের রাজনৈতিক ময়দানের বাঘ এবং ইউরোপের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণের মধ্যে অন্যতম হিসেবে বিবেচিত; তাদের মতে রাজনৈতিক ময়দানে তার শক্ত পদক্ষেপ ছিল। সে তার মত প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করতে সমর্থ হয়েছিল, অথচ তার ব্যভিচার ও চারিত্রিক কলুষতা ছিল সর্বজন বিদিত ব্যাপার। এসব অপরাধ তাদের নিকট তার মহত্বে!!! বিন্দুমাত্রও ছেদ ঘটায়নি।

এ লোকটির ছিল আটশত বান্ধবী এবং চল্লিশ জন অবৈধ পুত্র সন্তান। আর বলা হয়: সে যখন জানতে পারল যে, তার আমেরিকান স্ত্রী তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, তখন সে অর্ধেক রাত্রে জাগ্রত হল এবং সে মহিলাকে ঠিক-ঠিকানা বিহীন অবস্থায় রাতের অন্ধকারে রাস্তার মধ্যে নিক্ষেপ করল। আর তারা অবাক হয়ে গেল যে, এই ব্যক্তি কেন নিজের জন্য যা বৈধ করেছে, তা অপরের জন্য নিষিদ্ধ করল? আর এই কাহিনীর কোন কোন পর্যালোচনাকারী বলেন: কালমানসু (অনুরূপ প্রত্যেক মানুষখেকো বাঘ), সে ছিল নারীদেরকে সবচেয়ে বেশী অপমানকারী, সে ক্রীড়া-

কৌতুকের ছলে বলুক কিংবা রোগের শয্যায়, যে পরিমাণ মন্দ ও নিকৃষ্ট কথা নারীদের ব্যাপারে বলেছে, তা অন্য কেউ বলেনি।[১৫]

অবশেষে আমরা এই আলোচনার উপসংহারে এই দিকে ইঙ্গিত দিতে চাই যে, শরী‘আত যখন একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে বৈধ করেছে, তখন তাতে স্ত্রীদের মাঝে ভরণ-পোষণ, আবাসন ও সম্পর্কের সকল ক্ষেত্রে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার অপরিহার্যতার শর্তারোপ করেছে; আর যখন ন্যায় বা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে না পারে অথবা যুলুম-নির্যাতনের আশঙ্কা করে, তখন তার

জন্য অপর নারীকে বিয়ে করার পদক্ষেপ নেয়া বৈধ নয়।

যেমনিভাবে বৈধ নয় একজন পুরুষের জন্য চারের অধিক বিয়ে করা; আর এটা জাহেলী যুগের প্রভাব বিস্তারকারী অনেক স্ত্রী গ্রহণের অরাজক পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য পরিষ্কার সীমাবদ্ধকরণ। পরিশেষে বলা যায়, যে ব্যক্তি তার স্ত্রীদের মধ্যে ন্যায় বা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে, তার জন্য একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করা বৈধ; তবে বাধ্যতামূলক নয়।

*****

শরী‘আত বাস্তবায়ন

ইসলামী রাষ্ট্রের অমুসলিমদের ক্ষেত্রে শরী‘আতের বিধি-বিধান বাস্তবায়নের দু’টি দিক রয়েছে:

প্রথমত: যা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক অবস্থার সাথে সম্পর্কিত; এখানে প্রত্যেকে ধর্মের রয়েছে আলাদা আকিদা-বিশ্বাস। আর ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে ইয়াহূদী, খ্রিষ্টান ও অন্যান্য ধর্মের অনুসারীরা জীবনযাপন করছে, অথচ তাদের কোন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। ইসলামী রাষ্ট্রের দুর্বলতার সময়েও নয়, সবল অবস্থায়ও নয়। সব জাতি-ই বিজয়ী মুসলিমদেরকে ভালোভাবে স্বাগত

জানিয়েছে। এর প্রমাণ হল, ইসলামী রাষ্ট্রের দুর্বলতার সময়ে তাদের কেউই তার ইসলাম ত্যাগ করে নি, বরং আজকের এই দিন পর্যন্ত তারা তা দৃঢ়তার সাথে ধরে রেখেছে, সব ষড়যন্ত্র প্রতিরোধ করছে এবং আত্মমর্যাদার সাথে টিকে আছে। তাদের মধ্যে ইন্ডিয়ান, তুর্কি, মাগরেবী, আরব ও অন্যান্য জাতি অন্যতম।

অন্যদিকে ইউরোপীয় উপনিবেশ শাসকদের ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান ছিল তার উল্টো। তাদের উপনিবেশের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রচণ্ড সংগ্রাম চলছিল এবং এই উপনিবেশ

থেকে মুক্তি পাওয়াটাকে ‘স্বাধীনতা’ নামে নামকরণ করা হয়েছিল; অথচ মুসলিম জাতির এরূপ অবস্থান ইসলামের প্রতি এক দিনের জন্যও সৃষ্টি হয় না।

দ্বিতীয়ত: ব্যক্তিগত ও পারিবারিক আইন ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে এই ধরনের বিধিবিধানগুলো লেনদেন বিষয়ক, অপরাধ বিষয়ক ইত্যাদি হয়ে থাকে। ইসলাম ব্যতীত অপরাপর আইন-কানুনের ক্ষেত্রে এগুলোকে যেভাবে দেখা হয়, এ ক্ষেত্রেও একইভাবে দেখা-ই ইনসাফভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি।

আর প্রত্যেক আইন-কানুনের মূল বিষয়ই তো বৈধতা ও অবৈধতা। অথচ

আপনি স্পষ্ট সীমালঙ্ঘন লক্ষ্য করবেন যে, প্রশ্ন তৈরিকারক ব্যক্তি শরী'আত বাস্তবায়নকে স্বৈরাচারী বা একনায়কতন্ত্র বলে আখ্যায়িত করছে। যেখানে প্রত্যেকে আইন-কানুনই বাস্তবায়নের সময়ে শক্তিপ্রয়োগ করে বাস্তবায়ন করতে হয়, যাকে তাদের পরিভাষায় “আইনের প্রতি শ্রদ্ধা” নামে আখ্যায়িত করা হয়। তাই, কোনো রাষ্ট্র বা সরকার যখন আইন-কানুন বাস্তবায়ন ও প্রয়োগের প্রত্যয় ব্যক্ত করে, তখন তা কি স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র হতে পারে??

আর আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে, ধরা যাক, মিসর ও সুদানের মতো দেশে যদি শরী‘আত বাস্তবায়ন হয়; সে দু‘দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যে খ্রিষ্টান জনগোষ্ঠী আছে, তখন যদি তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক বিষয়সমূহে তাদের ধর্মীয় নিয়মনীতির আলোকে পরিচালনার নিশ্চয়তা দেওয়া হয়, যেমনিভাবে মুসলিমদেরও স্বতন্ত্র পারিবারিক আইন-কানুন রয়েছে; তারপরেও (অর্থাৎ পারিবারিক আইন ছাড়া অন্যান্য বিষয়ে) এ দুই দেশের খ্রিষ্টানগণ কোন্ আইন চায়? তারা কি ফরাসি, জার্মানি, ইতালি অথবা ইংরেজদের আইন চায়?

ইনসাফের দৃষ্টিতে এবং নিরপেক্ষ যৌক্তিক দেশপ্রেমী দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায়, তাদের উচিত মিসরী অথবা সুদানী আইনের দিকে ধাবিত হওয়া, যদি তারা দেশপ্রেমিক হন। একজন মিসরী খ্রিষ্টান ফরাসী আইন কেন চাইবে? একজন সুদানী খ্রিষ্টান, ইংরেজ আইন কেন দাবী করবে? পারিবারিক আইন এবং ধর্মীয় উপাসনা ব্যতীত অন্যান্য প্রশাসনিক ও ব্যবসায় আইন-কানুন এবং দণ্ডবিধির ক্ষেত্রে এক (দেশের) আইনের সাথে অন্য (দেশের) আইনের বিভিন্নতা রয়েছে, যদিও কোনো কোনো ধারা ও বিধান একই রকম। এসবের মাধ্যমেই আপনি বুঝতে পারবেন ইসলামী শরী‘আতের বিপক্ষে

সাদা-সাহবেদরে সভ্যতার পক্ষে কীরূপ চরম পক্ষপাতমূলক আচরণ ও বৈষম্য করা হয়ে থাকে।

বভিন্নি রাষ্ট্ররে আইন-কানুনরে বভিন্নিতা একটি সুপরচিতি ও সর্বজনবদিতি বষিয়। কন্তিু শাসন থকে শরী'আতকে দূর করার জ োর গলায় দাবি জানান োর পছিনে দু'টি কারণরে ক োন ো একটি কারণ রয়ছে:

প্রথম কারণ এই য,ে শরী'আতরে নয়িম-কানুন বাস্তবায়তি হল,ে তার মধ্যে বদ্যিমান সার্বকি পরপিূর্ণতা ও যথার্থতার ফলে তা তার অনুসারীদরেকে পরপিূর্ণ মুক্তি ও হারান ো স্বাধীনতা ফরিয়িে দবে।

অন্য একটি কারণ হচ্ছে, এই দাবি শুধু স্বৈরাচার, যার দ্বারা উদ্দেশ্য হল কোনো অঞ্চলে উষ্কানি ও গোলযোগ সৃষ্টি করা, যাতে এর মাধ্যমে সেই অঞ্চল অস্থিতিশীল থাকে এবং ঘোলা পানিতে মাছ শিকার করা সহজ হয়।

শরী‘আতের বাস্তবায়নে কীভাবে স্বৈরতন্ত্র বা একনায়কতন্ত্র হয়?! দূরের ও নিকটের সকলেই জানেন যে, ইসলামী শরী‘আতের বাস্তবায়নের ব্যাপারে যে গণভোটই অনুষ্ঠিত হয়, তাতে অধিকাংশই শরী‘আত বাস্তবায়নের পক্ষে মত দেয়; কিন্তু ‘সংখ্যালঘুদের অধিকার সংরক্ষণের’

ধুয়া তুলে শুধু সাদা-চামড়ার সাহেবেরাই তা চায় না। অন্যদিকে, যে কেউই প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারে যে, আফ্রিকার অনেক রাষ্ট্রে ‘সংখ্যাগরিষ্ঠের অধিকার’ কোথায়, যেসব রাষ্ট্র পরিচালনা করে বাইরের শক্তি সমর্থিত স্বৈরাচারী ক্ষমতাবান সংখ্যালঘু খ্রিষ্টানেরা?

দণ্ডবিধি (হুদূদ) ও শারীরিক শাস্তিসমূহ:

শারীরিক এবং শারীরিক নয় এমন সব হদ ও শাস্তিসমূহ কতগুলো বিধিবিধানের নাম, যেগুলোকে শরী‘আত আইন লংঘনকারীদের শাস্তি হিসেবে

বক্তব্য দিয়েছে। অনুরূপ শাস্তির বিধান পৃথিবীর সব আইনেই আছে।

এখন লক্ষ্য করতে হবে এই আইনপ্রয়োগ থেকে প্রাপ্ত উপকারিতা ও আইন প্রয়োগের প্রভাব ও ফলাফলের প্রতি; তা নিরাপত্তা রক্ষা করছে কিনা এবং তা মানুষের জীবন-যাপন, সফর ও চরিত্র সংরক্ষণে সক্ষম কিনা।

কোনো আইন থেকে একটি ধারা বা কোনো বিধিমালা থেকে একটি বিধান ছিনিয়ে বের করে তাকে ঐ আইন বা বিধিমালার দোষরূপে প্রকাশ করা সুবিচারের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং ইনসাফের দাবি হল গোটা বিধিমালা ও

আইনকে সামগ্রিকভাবে দেখো—অপরাধের শর্ত ও তার সংঘটন, শাস্তিপ্রদানের শর্ত এবং কারণসমূহকে দেখো।

উদাহরণস্বরূপ, ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে উল্লেখিত হাত কাটা ও পাথর নিক্ষেপে করে হত্যার এই শাস্তিসমূহের বাস্তবায়নের অতি স্বল্প-সংখ্যক বাস্তব উদাহরণ আপনি পাবেন, যে সংখ্যা এক হাতের আঙুলের সংখ্যা অতিক্রম করবে না। এটা এ জন্য নয় যে, উল্লেখিত শাস্তির বিধানসমূহ অবাস্তব ও অকার্যকর; বরং এর কারণ হলো শাস্তির কঠোরতার মধ্য দিয়ে শরী'আত কর্তৃক বাস্তবায়িত

শান্তি ও নিরাপত্তা, আর তারপর শাস্তি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে আরোপিত শর্তসমূহ; কারণ, সন্দেহ-সংশয়ের কারণেই হদ্ রদ করা হয়।

ব্যাপারটি আরও বাস্তবিকভাবে বোঝার জন্য আমরা আধুনিক কালের আইন-কানুনের বাস্তবতা আলোচনা করব।

আধুনিক জাতিগুলো, বিশেষ করে পশ্চিমা রাষ্ট্রসমূহ বিধ্বংসী অস্ত্র, দ্রুত মৃত্যু কার্যকারী অস্ত্র, আধুনিক প্রযুক্তি, সুদক্ষ উপকরণ এবং চমৎকার আবিষ্কার করতে পেরেছে, বিশেষ করে অপরাধের ক্ষেত্রে অনুসন্ধান, গবেষণা ও তৎসংশ্লিষ্ট

পদ্ধতি, অপরাধীদের অনুসন্ধানের জন্য জনসচেতনতামূলক মিডিয়া এবং সংস্কৃতি, শিক্ষার অগ্রগতি ও সচেতনতা দ্বারা ব্যক্তি ও সংগঠন আলোকিত করা ইত্যাদিতে। আর এতসব সত্ত্বেও অন্যায়-অপরাধের মাত্রা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অপরাধীদের ঔদ্ধত্য ও স্বেচ্ছাচারিতা বৃদ্ধিই পাচ্ছে। এটা হল একটা দিক।

অপরদিকে তাদের মনোযোগ অপরাধী ও তাদের কুকর্মকে সংস্কার ও সংশোধন। তারা চেয়েছে জেলখানাকে তারা সংশোধনের স্থান ও সংস্কার-কেন্দ্র হিসেবে তৈরি করবে এবং অপরাধীদেরকে রোগী হিসেবে বিবেচনা

করে তাদেরকে শাস্তির চাইতে চিকিৎসার বেশি উপযুক্ত হিসেবে চিহ্নিত করেছে। আর তাদের অপরাধের দায় চাপিয়েছে উত্তরাধিকারগত, পরিবেশগত ও সামাজিক বিশৃঙ্খলার উপর। এটি সঠিক, অস্বীকার করার উপায় নেই; কিন্তু বিষয়টি এই একটি দিকের মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। কারণ, অসুস্থ অঙ্গ অনেক সময় কেটে ফেলার মধ্যেই কল্যাণ নিহিত রয়েছে, যাতে তার রোগ গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়তে না পারে; আর তা যৌক্তিক ও বাস্তব বলেই স্বীকৃত।

আর সামাজিক বিশৃঙ্খলা তো সমাজের ব্যক্তিদের দুর্নীতি ও অন্যায়েরই সমষ্টি।

অন্যদিকে জেলখানায় অনেকে অপরাধীর অন্তর আরও কঠোর হয়ে যায় এবং সেখান থেকে তারা তীব্র ক্ষোভ ও প্রচণ্ড দুঃখ নিয়ে বের হয়। সেখানে চোর, গুণ্ডা ও খুনীরা সহজেই তাদের পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে পরস্পরকে সহযোগিতা করতে পারে এবং তারা জেলখানাকে পারস্পরিক আলোচনা ও কাজ বণ্টনের অভয়ারণ্য বানিয়ে নিতে পারে। তাদের এই অপকর্মে তাদের বিভ্রান্ত ভাইয়েরা

খাঁচার বাইরে থেকে এ ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে পারে।

আর আপনি পর্যবেক্ষণ করে এবং বুঝে থাকবেন যে, অপরাধীদের সংশোধন-পরিকল্পনা ও নরম চিকিৎসার ধারণার উপর অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে, তা সত্ত্বেও অপরাধ বহুগুণে বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই এই পরিকল্পনাটি নিছক একটা কল্পনা ও মরীচিকা ছাড়া আর কিছুই ছিল না।

আধুনিক মানবসমাজ ও সভ্য জগতে বেপরোয়াভাব, বৈধকরণ এবং মানুষের জান, মাল ও ইয্যতকে সস্তা পণ্যরূপে গণ্য করার ক্ষেত্রে এমনভাবে শীর্ষে

পৌঁছে গেছে; যার ফলে মানবরচিত আইন-কানুনে এসব ভয়ংকর অপরাধীদের কুকর্মের যে শাস্তি নির্ধারণ করা হয়েছে, তা তাদের অপরাধের তুলনায় খুবই দুর্বল ও ক্ষীণ। এসব খুনী-হত্যাকারী ও রক্তপাতকারীদের কী করুণা বা ভদ্রতা প্রাপ্য হতে পারে? তাদের অপরাধের বলি নিরপরাধ মানুষদের ব্যাপারে কি তারা দয়া বা করুণার পরিচয় দিয়েছে? আর তারা কি সমগ্র সমাজের প্রতি দয়া দেখিয়েছে? বরং অপরাধ বিষয়ক পদক্ষেপের যত উন্নতি হচ্ছে, অপরাধীদের কৌশল ও উপায়-উপকরণেরও তত উন্নতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। এমনকি তারা এমন বাহিনী গঠন

করছ, যা কখনও কখনও সামর্থ্য, উপায়-উপকরণ ও প্রস্তুতির দিক থেকে রাষ্ট্র ও সরকারকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। মাদকব্যবসায়ীদের সংবাদ ও অপরাধের বৃদ্ধির খবর আমরা শুনে যাচ্ছি; তারা দৃষ্টির আড়াল থেকে বের হয়ে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে, এমনকি তারা সরকার ও বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের সাথে প্রকাশ্যে দরদস্তুর করছে! আমি জানি না ঐ দরদ উথলে-পড়া ব্যক্তিরা তাদের ক্ষেত্রে কোন শাস্তি দিবেন??

পূর্বালোচনার উপর ভিত্তি করে বলা যায় যে, বর্তমান ধারার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতা মানুষকে বিপদ ও দুরাবস্থা থেকে পরিত্রাণ দিতে

সম্পূর্ণ ব্যর্থ। মানুষ এখন পৃথিবীর আকাশে, জলে, স্থলে, আপন গৃহে, অফিস-আদালতে, শিল্প-কারখানায় ও পথে-ঘাটে ভয়-ভীতি ও ত্রাসে জীবনযাপন করছে।

আর আজকের অপরাধীরা (যেমনটি ইতোপূর্বে বলেছি) শিক্ষা-দীক্ষায় পুরো প্রস্তুত; পুলিশি প্রশাসনের উন্নতি এবং সংশ্লিষ্ট উপায়-উপকরণসমূহের নতুনত্বের সাথে সাথে তারাও উন্নত হয়ে যায়; আর শান্তি ও নীরাপত্তারক্ষী বাহিনীদের পরিকল্পনা করার মতো তারাও পরিকল্পনা করে। উভয়ের মধ্যে সবসময় যুদ্ধাবস্থা— এই অবস্থা দূর করতে হলে

সুবিচারপূর্ণ সতর্ককারী শাস্তির কোন বিকল্প নেই। তবুও কি তারা বুঝতে পারছে না...!

পরিশেষে বলা যায়, কিছু কিছু শারীরিক শাস্তির বিধান অনেক আধুনিক আইন-কানুনেও প্রয়োগ করা হয়। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মৃত্যুদণ্ড। এই শাস্তিটি কোনো কোনো আইনে বিলুপ্তও হয়েছিল, কিন্তু তারপর তারা আবার ফিরেও এসেছে। আর আমাদের মুসলিমদের গ্রন্থে একটি ব্যাপক ও অকাট্য বক্তব্য রয়েছে—

﴿ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكۡمٗا لِّقَوۡمٖ يُوقِنُونَ ٥٠ ﴾
[سورة المائدة: ٥٠]

“নিশ্চিত বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিধানদানে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর?” — (সূরা আল-মায়িদা: ৫০)

*****

আল্লাহর পথে জিহাদ (الجهاد في سبيل الله)

জিহাদ প্রসঙ্গে প্রদত্ত বক্তব্যে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির জন্য শক্তি ও তার আবশ্যকতা সম্পর্কে একটি আলোচনা অন্তর্ভুক্ত থাকবে। অনুরূপভাবে ইসলামের প্রকৃতরূপ ও অপারাপর ধর্মসমূহ থেকে তার বিশেষ ভিন্নতা সম্পর্কিত বর্ণনা এবং

মুসলিম ‘জাতি’ বা উম্মাতের তাৎপর্য ও এর সাথে ইতিহাসবিদ ও সমাজবিজ্ঞানীদের নিকট প্রচলিত ‘জাতি’র ধারণার পার্থক্য ইত্যাদি বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হবে। অতঃপর মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে ইসলামে জিহাদের মূলতত্ত্ব এবং এর সাথে শুধু الحرب (যুদ্ধ) অথবা শুধু القتال (মারামারি) শব্দের অর্থের পার্থক্য সম্পর্কে। তারপর আলোচনা করা হবে الجهاد (জিহাদ) শব্দকে তার অর্থ সীমাবদ্ধকারী শব্দ في سبيل الله (আল্লাহর পথে) -এর সাথে সংযুক্ত করার তাৎপর্য সম্পর্কে।

শক্তি:

শক্তি হল একটি প্রশংসনীয় বস্তু ও কাঙ্ক্ষিত বিষয়; আর এটা এমন এক বিশেষ গুণের নাম, যার প্রতি মানব আত্মা আকৃষ্ট এবং যাকে মানব আত্মা পছন্দ করে। আর মানুষ যখন দৃঢ়তার সাথে তার কর্মগুলো গ্রহণ করে এবং শক্তিমত্তার সাথে তার কার্যাবলী সমাপ্ত করে ও তার বিষয়সমূহ পরিচালনা করে, তবে সে যা চায় তা যথাযথভাবে করতে সক্ষম হবে; চাই সে শক্তিটা চৈন্তিক শক্তি, জ্ঞানগত শক্তি, অথবা বস্তুগত শক্তি।

সুতরাং শক্তিশালী দেহ, শক্তিশালী মতামত এবং শক্তিশালী ব্যক্তিত্ব—

এ ধরনের সবকিছুই পছন্দনীয় গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

আর এটা সর্বজনবিদিত যে, শক্তির ব্যাপারটি তখনই পছন্দনীয় ও উত্তম বলে বিবেচিত হবে, যখন তার ব্যবহার হবে উত্তম পন্থায় এবং সকল মানুষের জন্য উপকারী ক্ষেত্রে।

একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রই পারে তার গাম্ভীর্য ও মর্যাদা রক্ষা করতে, যতক্ষণ পর্যন্ত এই গুণ তার সাথে সম্পৃক্ত থাকে।

আর এটা আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত একটি অন্যতম প্রচলিত নিয়ম, যার উপর জীবন-যাত্রা প্রতিষ্ঠিত; তাই ঐ

সত্যে কোন কল্যাণ নেই, যার বাস্তবায়ন নেই; আর ঐ সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে না, যতক্ষণ না তার সাথে এমন শক্তির সংযোজন হবে, যা তার সংরক্ষণ করবে এবং তাকে পরিবেষ্টন করে রাখবে।

আর দুনিয়ার জাতি ও রাষ্ট্রসমূহ স্থান, কাল ও পাত্রভেদে বিভিন্ন পদ্ধতি ও প্রকারে তার শক্তি প্রস্তুত করে যাচ্ছে। তাছাড়া আমাদের বর্তমান যুগে শক্তির বিভিন্ন প্রকার আবিষ্কৃত হয়েছে; আর উপায়-উপকরণের প্রস্তুতি সকল কল্পনার বাইরে চলে গেছে। এটা হল শক্তি ও তার গুরুত্বের ব্যাপারে ভূমিকা।

আর অপর ভূমিকাটি ইসলাম ও তার অনুসারীদের প্রকৃতির সাথে সম্পর্কিত। অমুসলিমগণ, বিশেষ করে খ্রিষ্টানগণ এবং তাদের পরবর্তীতে পশ্চিমাগণ ইসলামকে ভুল বুঝে যখন ধারণা পোষণ করে যে, ইসলাম হচ্ছে কতগুলো অদৃশ্য বিশ্বাস ও আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের সমষ্টির মধ্যে সীমাবদ্ধ একটি ধর্ম; ফলে তাদের ধারণা অনুসারে ইসলাম ব্যক্তিগত ব্যাপার মাত্র; আর একজন মানুষ তার ইচ্ছা অনুযায়ী নিজের জন্য আকিদা-বিশ্বাস ও ধর্ম পছন্দ করবে এবং সে তার পছন্দসই পদ্ধতিতে তার প্রতিপালকের উপাসনা করবে। তাদের নিকট ব্যাপারটি এতেই সীমাবদ্ধ।

কিন্তু ইসলামের প্রকৃত অর্থ ও উদ্দেশ্য অন্যরকম; কেননা তা হল আন্তরিকভাবে বিশুদ্ধ বিশ্বাসের নাম; আল্লাহকে একমাত্র ইলাহ বলে বিশ্বাস করা এবং এই বিশ্বাস লালন করা যে, তিনি ব্যতীত অন্য কেউ ইবাদাতের যোগ্য নয়, যিনি পরিপূর্ণ গুণাবলী দ্বারা গুণান্বিত এবং সকল প্রকার দোষ-ত্রুটি ও অপরিপূর্ণতা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। একই সাথে ইসলাম একটি প্রজ্ঞাপূর্ণ শরী‘আত তথা বিধানের নাম, যা মানুষের ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে; নিরাপদ জীবনে ও যুদ্ধ জীবনে; পরিবার-পরিজন, নিকটতম ব্যক্তি ও দূরতম ব্যক্তি, শত্রু ও বন্ধুর সাথে তার আচার-

আচরণ; শরী‘আত, বিধিবিধান, আদব-কায়দা ও শিষ্টাচারসহ যত প্রয়োজন রয়েছে তার সবকিছুকেই অন্তর্ভুক্ত করে; আরও অন্তর্ভুক্ত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, চারিত্রিক ও অর্থনৈতিক নীতিমালাসহ দুনিয়ার সকল বিষয় ও বস্তুকে।

আর ইসলামের অনুসারীগণ সমাজবিজ্ঞানীদের মাঝে প্রচলিত ধারণার কোন ‘জাতি’ নয়; কারণ, তাদের মতে ‘জাতি’ অর্থ ‘একটা মানবগোষ্ঠী, যারা তাদের মধ্যকার নির্দিষ্ট কিছু বৈশিষ্ট্যে পরস্পর একতাবদ্ধ ও সংঘবদ্ধ। পক্ষান্তরে ইসলামের দৃষ্টিতে এমন প্রত্যেকে

ব্যক্তিই ‘মুসলিম জাতি’ বা উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত, যে ব্যক্তি ইসলামকে দীন হিসেবে গ্রহণ করেছে; সে যে শ্রেণী, বর্ণ, অথবা পূর্ব ও পশ্চিমের যে দেশেরই হোক না কেন।

জিহাদের হাকীকত:

ধর্ম ও জাতি সম্পর্কে এই বিস্তারিত আলোচনার পর সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, ইসলাম একটি সংকীর্ণ ধর্ম নয় এবং ইসলামের অনুসারীগণ নিজেদের মধ্যে সীমাবদ্ধ কোন জাতি নয়। আর তার উপর ভিত্তি করেই সত্যকে প্রকাশ, প্রচার ও সম্প্রসারণের জন্য জিহাদকে শরী‘আতের অন্তর্ভুক্ত করা

হয়েছে, যাতে সকল মানুষ ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করে।

আর এ পর্যায়ে মনোযোগ আকর্ষণ করা যুক্তিযুক্ত হবে যে, ইসলামী পরিভাষা হচ্ছে الجهاد (জিহাদ)। الحرب (যুদ্ধ) অথবা القتال (মারামারি) নয়।

কারণ, الحرب (যুদ্ধ) শব্দটি দ্বারা অধিকাংশ সময় এমন যুদ্ধ বুঝানো হয়, যার লেলিহান শিখা জ্বলে উঠে এবং আগুন ছড়িয়ে পড়ে ব্যক্তিগত, জাতিগত ও বস্তুগত উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য ব্যক্তি, দল ও গোত্রসমূহের মধ্যে। পক্ষান্তরে ইসলাম কর্তৃক অনুমোদিত যুদ্ধ এরূপ উদ্দেশ্য বা স্বার্থ হাসিলের জন্যে নয়।

ইসলাম এক সম্প্রদায়কে বাদ দিয়ে অন্য সম্প্রদায়ের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দেয় না এবং এক জাতিকে বাদ দিয়ে অন্য জাতির উন্নতি বিধান করাও ইসলামের উদ্দেশ্য নয়; আর তার কাছে এটা কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নয় যে, কোন শাসক কোন ভূমির মালিকানা লাভ করেছে এবং তার উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেছে। বরং ইসলামের উদ্দেশ্য হল মানুষের সৌভাগ্য ও সফলতা। সুতরাং এ ছাড়া অন্যসব লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে ইসলামে বিবেচনা করা হয় না; বরং এ জাতীয় চিন্তা-ধারা প্রতিরোধে ইসলাম বদ্ধ-পরিকর, যাতে গোটা দীন তথা জীবনব্যবস্থা আল্লাহর জন্য হয়ে যায়; গোটা পৃথিবী

আল্লাহর জন্য হয়ে যায় এবং আল্লাহর নেক বান্দাগণ যাতে পৃথিবীর ওয়ারিশ হয়। আর এই সবের জন্যই ইসলামী জিহাদ পরিচালিত হয়; এই জন্য নয় যে, কোন জাতি এককভাবে সকল কল্যাণকে কুক্ষিগত করবে, অথবা এককভাবে সকল সম্পদ করায়ত্ত করবে; বরং ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য হলো যাতে গোটা মানবজাতি ইসলামের পতাকাতলে মানবিক সফলতা অর্জনের মাধ্যমে সৌভাগ্যবান হয়।

এ লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্যই বিচক্ষণতা, উত্তম উপদেশ ও সর্বোত্তম পন্থায় বিতর্কের মাধ্যমে সকল প্রকার শক্তি ও উপায়-উপকরণ

প্রয়োগ করা হয়। এরপরই আসে ব্যাপক ও গভীর অর্থবোধক ‘জিহাদ’ শব্দটি।

জিহাদ, যার অর্থ সর্বোচ্চ চেষ্টা ও শক্তি-সামর্থ্য ব্যয় করা, এই শব্দটির অর্থ ব্যাখ্যা এবং তাকে অন্যান্য সমার্থবোধক শব্দের উপর নির্বাচন করার তাৎপর্য বিশ্লেষণ করার পর ইসলামী পরিভাষায় তার সাথে যুক্ত একটি বাক্যাংশের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা প্রয়োজন। আর তা হচ্ছে, ‘في سبيل الله (আল্লাহর পথে)’ বাক্যাংশটি।

নিশ্চয় তা স্পষ্টভাবে এই ইসলামী শক্তির উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে নির্ধারণ

করে দেয়। এটা এমন শর্ত, যার থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হওয়ার সুযোগ নেই; বরং যদি তার থেকে আলাদা হয়, তবে পরিভাষাটি বাতিল হয়ে যাবে, বিষয়টি নষ্ট হয়ে যাবে এবং মূল উদ্দেশ্যের বিলুপ্তি ঘটবে।

في سبيل الله (আল্লাহর পথে) মানে হল, মুসলিম ব্যক্তির প্রত্যেকটি কাজই সম্পাদিত হওয়ার পিছনে যখন সর্বপ্রথম উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, অতঃপর উদ্দেশ্য হবে সর্বসাধারণের কল্যাণ সাধন ও জাতির সুখ-সমৃদ্ধি, তখন তা ‘আল্লাহর পথে’ বলে গণ্য হবে। সুতরাং ভাল ও কল্যাণকর কাজে অর্থ খরচের

ক্ষেত্রে যখন তার দ্বারা দানকারীর উদ্দেশ্য হয় দুনিয়ার ফায়দা হাসিল করা অথবা জনসাধারণের প্রশংসা কুড়ানো, তবে তা 'আল্লাহর পথে' বলে গণ্য হবে না; সে যদিও তা মিসকিন অথবা নিঃস্বকে দান করে।

في سبيل الله (আল্লাহর পথে) এমন একটি পরিভাষা, যা এমন কর্মকাণ্ডের উপর প্রযোজ্য, যে কর্মকাণ্ড সম্পাদিত হয়েছে কোন প্রকার খেয়াল-খুশি ও কুপ্রবৃত্তির মিশ্রণ ছাড়াই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে। আর জিহাদের ক্ষেত্রে এই শর্তারোপ করা হয়েছে শুধুমাত্র এই অর্থকে বুঝানোর জন্যই। সুতরাং

সঠিক ইসলামী জিহাদের জন্য আবশ্যক হল, তা সকল প্রকার বৈষয়িক উদ্দেশ্য, খেয়াল-খুশি, অথবা ব্যক্তিগত ঝোঁক-প্রবণতা থেকে মুক্ত থাকবে; একটি সুবিচারপূর্ণ শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্য থাকবে না, যেখানে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করবে, সত্যকে সম্প্রসারিত করবে এবং ন্যায়নীতির সহায়তা করবে।

আর আল-কুরআনের বক্তব্যে রয়েছে;

﴿ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِۖ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ يُقَٰتِلُونَ فِي سَبِيلِ ٱلطَّٰغُوتِ﴾ [سورة النساء: ٧٦]

“যারা মুমিন তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে এবং যারা কাফির তারা তাগূতের

পথে যুদ্ধ করে।” — (সূরা আন-নিসা: ৭৬)

আর হাদিসে নববীর বক্তব্যের মধ্যে রয়েছে:

« من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز و جل» (البخاري و مسلم و أبو داود و النسائي و ابن ماجه و أحمد).

“যে ব্যক্তি আল্লাহর কথাকে সমুন্নত করার জন্য যুদ্ধ করে, সে আল্লাহ পথে যুদ্ধ করে। ...” —(বুখারী, কিতাবুল ‘ইলম, বাব নং- ৪৫, হাদিস নং- ১২৩; একইভাবে বর্ণনা করেন ইমাম মুসলিম, আবূ দাউদ, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ ও আহমদ)।

আর এই অর্থের বর্ণনা, তার প্রতি দৃঢ়তা ও তার প্রতি বাধ্যবাধকতার প্রয়োজনীয়তার বর্ণনা দ্বারা আল-কুরআন ও সুন্নাহ পরিপূর্ণ।

পৃথিবীর বিভিন্ন জাতি ও শক্তি:

এটাই যদি হয় ‘ইসলাম’, ‘মুসলিম জাতি’ ও ‘আল্লাহর পথে জিহাদের মর্মার্থ ও তাৎপর্য’; আর ‘শক্তি’ যদি জাতি ও ব্যক্তিদের জন্য জীবনের বস্তুগত ও ভাবগত দিক দিয়ে সঠিকভাবে চলার অপরিহার্য বিষয় হয়; তখন আশ্চর্য হওয়ার কিছু নেই যে, ইতিহাসের দীর্ঘ পরিক্রমায় সকল জাতি ও উম্মতই শক্তিকে পছন্দ করেছে; তাদের অবস্থানকে সুসংহত করার জন্য এবং

সম্মান ও নিরাপত্তার সাথে জীবনযাপনের জন্য শক্তির প্রস্তুতি নিয়েছে।

আর আলোচনার একেবারে শেষ প্রান্তে এসে আমি ঐ অপশক্তির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা ভাল মনে করছি, যে অপশক্তি ইতিহাসের সর্বকালে উপনিবেশবাদের সঙ্গী হয়েছে; উপনিবেশবাদীগণ পৃথিবীর পূর্ব ও পশ্চিমের দুর্বল জাতিদের উপর ঐসব শক্তি ও যুদ্ধের উষ্কানি দিয়েছে এবং তারা বিভিন্ন দেশের ভিতরে তাদের পণ্যের জন্য বাজার ও তাদের উপনিবেশের জন্য ভূখণ্ডের সন্ধানে খুঁজে-বেড়িয়েছে, যাতে তারা সম্পদের

উৎসগুলো কুক্ষিগত করতে পারে, আর অনুসন্ধান করতে পারে আল্লাহর প্রশস্ত জমিনের বিভিন্ন প্রকারের খনি ও ভাণ্ডার, যেগুলো মূল মালিকদের বাদ দিয়ে তাদের উদরপূর্তির উদ্দেশ্যে খাদ্য-শস্য যোগাবে আর তাদের শিল্প-কারখানায় কাঁচা মাল যোগান দিবে।

আর তাদের এই অনুসন্ধানের সময়ে তাদের অন্তরসমূহ লোভ-লালসায় ভরপুর ও আত্মাসমূহ অতি লালসায় উন্মুক্ত থাকে; তাদের সামনে থাকে ভয়ংকর ট্যাঙ্কসমূহ এবং মাথার উপরে আকাশ সীমায় থাকে হাজার হাজার প্রশিক্ষিত সৈনিক দ্বারা গঠিত

বিমানবহর। তারা দেশের পর দেশের রিযিক ছিনিয়ে নিয়ে এবং সে দেশগুলোর নিরুপদ্রব অধিবাসীদের সুন্দর-সম্মানিত জীবনকে ছিন্ন-ভিন্ন করে দেয়। তাদের যুদ্ধগুলো আল্লাহর পথে ছিল না, বরং তা ছিল ব্যক্তিগত খেয়াল-খুশি ও স্বেচ্ছাচারী প্রবৃত্তির পথে। হামলার পর হামলা, আক্রমণের পর আক্রমণ চালানো হয়েছে সেসব শান্ত নিরীহ জাতি ও গোষ্ঠীর উপর, যাদের অপরাধ শুধু এই ছিল যে, আল্লাহ তা‘আলা তাদেরকে এমন জমিনের খনি ও গুপ্তধন দ্বারা অনুগ্রহ করেছেন, যার অভ্যন্তরে রয়েছে খনিজ সম্পদ এবং উপরিভাগে রয়েছে উর্বরতা। অথবা আক্রমণ চালানো হয়েছে তাদের

পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য কিংবা তাদের সেইসব স্বজাতির ব্যক্তিদের মনোরঞ্জনের ব্যবস্থা করার জন্য, যাদের স্থান তাদের দেশেও হয় না। আর সবচেয়ে ন্যক্কারজনক বিষয় হল, তারা কখনও কখনও একটা শান্তিপূর্ণ দেশে আক্রমন করে শুধু এই জন্য যে, সেই দেশটি এমন একটি দেশের পথে অবস্থিত, যার উপর তারা ইতঃপূর্বে কর্তৃত্ব লাভ করেছিল।

কিন্তু তারা আজকের এই দিনে সভ্যতার কথা বলছে এবং আন্তর্জাতিক আইন-কানুন ও চুক্তি অনুসরণের কথা প্রকাশ করছে। তারা নিঃসন্দেহে এই ব্যাপারে আস্থাবান

হয়েছে এই কারণে যে, তাদের পদসমূহ স্থিতি লাভ হয়েছে এবং তারা নিজেদেরকে সুবিন্যস্ত করতে পেরেছে। আর যদি এসব স্বার্থ থেকে কোন কিছু বিনষ্ট হত, তবে তারা কোনো প্রতিশ্রুতি রক্ষা করত না এবং তখন তারা কোনো আইনের তোয়াক্কা করত না। আর আইনের ব্যাখ্যায় ও কথার মার-প্যাঁচে তাদের এমন দক্ষতা রয়েছে, যা তাদের জন্য আইনের বেষ্টনী থেকে বের হওয়ার হাজারটা পথ হাজারটা পারাপারের স্থান তৈরি করে দিতে পারে। এ ছাড়াও তারা নিজেদেরকে পারমাণবিক বোমা, হাইড্রোজেন বোমা, জীবাণু বোমা, রাসায়নিক বোমা ইত্যাদির মতো এমনসব বিধ্বংসী

অস্ত্র তৈরি করে প্রস্তুত করে নিয়েছে, যে অস্ত্রের চিন্তা বিতাড়িত শয়তানের মনেও উদয় হয় না! এতদসত্ত্বেও আপনি এমন ব্যক্তিকে পাচ্ছেন, যে ইসলামী জিহাদের বিষয়ের সাথে কট্টরপন্থা, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি, অযথা রক্তপাত ইত্যাদি নানা ধরনের মিথ্যাকে জুড়ে দিয়ে উত্থাপন করে; অথচ প্রগতিশীলতায় মোড়ল রাষ্ট্রই সেই দিন হিরোশিমায় আণবিক বোমা ফেলেছিল।

হায়! তারা যদি একটি সত্য কথা বলত আল্লাহর ওয়াস্তে এবং আল্লাহর পথে...!

আর আল্লাহ তাওফিক দেয়ার মালিক এবং তিনি সত্য ও সঠিক পথের সন্ধান দিয়ে থাকেন।

লেখক:

সালেহ ইবন আবদিল্লাহ ইবন হুমাইদ

মক্কাতুল মুকাররামা।

* * *

গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থপঞ্জি

১. সীরাতু ইবনে হিশাম।

২. শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যা, মাজমু‘ ফাতাওয়া (مجموع فتاوى)।

৩. তারিখু ইবনে কাছির, আল-বেদায়া ওয়ান নিহায়া (البداية و النهاية)।

৪. মুহাম্মদ আল-গাযালী, হুকুকুল ইনসান (حقوق الإنسان)।

৫. আবদুল ওহাব আবদুল আযীয আশ-শীশানী, হুকুকুল ইনসান ওয়া হুররিয়াতুহুল আসাসীয়্যাহ (حقوق الإنسان و حرياته الأساسية)।

৬. মুহাম্মদ আত-তাহের ইবন ‘আশুর, উসূলুন নেযাম আল-ইজতিমায়ী ফিল ইসলাম (أصول النظام الاجتماعي في الإسلام)।

৭. মুহাম্মদ আল-গাযালী, হাযা দিনুনা (هذا ديننا)।

৮. আবদুল কাদের ‘আউদাহ, আত-তাশরী‘উল জিনা’ঈ (التشريع الجنائي)।

৯. আবুল আ‘লা আল-মওদুদী, আল-জিহাদ ফী সাবিলিল্লাহ (الجهاد في سبيل الله)।

১০. মুহাম্মদ সা‘ঈদ রমযান আল-বূতী, হাযিহি মুশকিলাতুহুম (هذه مشكلاتهم)।

১১. খালিদ মুহাম্মদ ‘আলী আল-হাজ্জ, আল-কাশ্শাফ আল-ফরীদ ‘আন মা‘য়াবিলিল হাদম ওয়া নাকায়িদিত তাওহীদ (الكشاف الفريد عن معاول الهدم و نقائض التوحيد)।

*****

স্বাধীনতা বিষয়ক প্রশ্নসমূহ:

আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে চিন্তা ও বিশ্বাসের যে স্বাধীনতা দান করেছেন তার মধ্যে এবং তিনি যে তাকে তার ধর্ম পরিবর্তন করতে নিষেধ করেছেন (হত্যার মত চূড়ান্ত শাস্তি প্রয়োগসহ) তার মধ্যে সমন্বয়সাধন কিভাবে সম্ভব? যদিও এই পরিবর্তন প্রকাশ পায় গভীর চিন্তা থেকে উদগত ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত থেকে এবং গুরুত্বপূর্ণ কারণে?

মুসলিমগণ মনে করে, এটা খুবই স্বাভাবিক যে, খ্রিষ্টানগণ তাদের আকিদায় বিশ্বাসী ভাইদের ইসলাম গ্রহণের অধিকারের স্বীকৃতি দিবে …

তাহলে আল্লাহ মানুষকে যে স্বাধীনতা প্রদান করেছেন তার প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করে খ্রিষ্টধর্মে প্রবেশে আগ্রহী মুসলিমদের জন্য সে একই অধিকার ভোগ করা সম্ভব নয় কি?

ইসলাম কি ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে খ্রিষ্টানদেরকে ঐ স্বাধীনতা প্রদান করতে প্রস্তুত, যে স্বাধীনতা খ্রিষ্টান রাষ্ট্রে মুসলিমগণ ভোগ করে থাকে; যার মধ্যে রয়েছে মসজিদে প্রবেশ করা, স্বাধীনভাবে তাদের ধর্মের ব্যাখ্যা করা এবং জনসাধারণকে খ্রিষ্টান আকিদা-বিশ্বাস গ্রহণের জন্য আহ্বান করা?

কিভাবে তাগিদ দেয়া যুক্তিসঙ্গত হতে পারে যে, আল্লাহ তা‘আলা পুরুষ ও নারীর জন্য সমান স্বাধীনতা দান করেছেন; এরপর মুসলিম নারী এমন পুরুষ ব্যক্তিকে পছন্দ করা থেকে বিরত থাকে, যাকে বিয়ে করতে তার আগ্রহ আছে, যদি সে মুসলিম না হয়?

আমাদের পক্ষে হাত কেটে দেওয়া, বেত্রাঘাত করা, অথবা পাথর মেরে হত্যা করার মত শারীরিক শাস্তির ব্যাখ্যা করা কিভাবে সম্ভব হতে পারে; অথচ এগুলো আল-কুরআনের কিছু আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত?

সমতা বা সমানাধিকার বিষয়ক প্রশ্নসমূহ:

দাসপ্রথার নিন্দা বা দাসপ্রথার বিলুপ্তি না করে দাসের উপর স্বাধীন মানুষের প্রাধান্য দেয়ার পক্ষে সমর্থনের অর্থ কী?

কেন বলা হয় যে, আল্লাহ তা'আলা মানুষকে অধিকার ও দায়িত্বের ক্ষেত্রে সমান করে সৃষ্টি করেছেন; যেখানে ধর্মীয় কারণে অসমতাকে গ্রহণ করা হয়? যেমনভাবে মুসলিমকে অমুসলিমের উপর প্রাধান্য দেয়ার কথা প্রকাশ করা হয়, যদিও শেষোক্ত ব্যক্তিটি আহলে কিতাব হয়, কিংবা সে অন্য কোনো ধর্মের অনুসারী হয়, অথবা অবিশ্বাসী তথা নাস্তিক হয়?

আর ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে আমরা আইনী ও সামাজিক ক্ষেত্রেও এই ধরনের অসমতা পাই।

আর আমরাও প্রশ্ন করি, একই ধরনের অধিকার নিয়ে মুসলিম, খ্রিষ্টান, ইয়াহূদী এবং অবশিষ্ট বিশ্বাসী বা অবিশ্বাসী মানুষের পারস্পরিক সম্প্রীতির সাথে বসবাস করার সাথে ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের কোন বিরোধ আছে কি? বিশেষ করে মুসলিম ও অমুসলিমের ক্ষেত্রে কোন পার্থক্য করা ছাড়াই শরী‘আতের আইন বাস্তবায়নের বিষয়টিতে?

আর এক শ্রেণীর লোককে অপর শ্রেণীর উপর প্রাধান্য দেয়ার বিষয়টি

গ্রহণ করা হবে কেন? আর এটা এমন একটা বিষয়, যার ভিতরে আমারা নিম্নোক্ত বিষয়গুলো দেখতে পাই:

১. একাধিক স্বামী গ্রহণ নিষিদ্ধ; অথচ একাধিক স্ত্রী গ্রহণ বৈধ।

২. স্বামী তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করতে পারে কোনো যথাযথ কারণ প্রদর্শন এবং ফলাফল ভোগ ব্যতীত; যেখানে নারীর পক্ষে অনেক কষ্টে এবং শুধুমাত্র আইনী প্রক্রিয়াতেই কেবল তালাক পেতে পারে।

৩. সন্তানদের উপর অভিভাবকত্বের অধিকার পিতার জন্য স্বীকৃত, যদিও শিশুরা তার মায়ের লালন-পালনে থাকে।

৪. উত্তরাধিকারের দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, নারীর অংশ অধিকাংশ সময় পুরুষের অংশের অর্ধেকের চেয়েও কম হয়ে থাকে।

পরিশেষে, আমরা আল্লাহর ক্ষেত্রে যৌক্তিক সম্পর্ক কোথায় পাব, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাদের সকলকে ভালবাসেন; একই সাথে আমরা আল-কুরআনের বক্তব্যের মধ্যে পাচ্ছি যে, আল-কুরআন কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত করছে?

আর যে ইসলামী রাষ্ট্রের মধ্যে শরী‘আতের নিয়ম-কানুনসমূহ বাস্তবায়ন করা হয়... সেখানে কি (ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক, সামাজিক,

রাজনৈতিক, পারিবারিক ইত্যাদি সকল প্রকারের) বহুত্বের অস্তিত্বকে কি স্বাধীনতা ও সমতার নিশ্চয়তা প্রদানপূর্বক আল্লাহর অনুগ্রহ বলে বিবেচনা করা হবে, নাকি স্বৈরাচারী কায়দায় সকলের উপর শরী'আত চাপিয়ে দেয়া হয়, যেমনটি আমরা বর্তমান সময়ে অনেক ইসলামী রাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ করছি?

*****

---

[১] দেখুন: আল-মাকাসেদুল হাসানা (المقاصد الحسنة), পৃ. ২০০ - ২০১

[২] বইয়ের শেষাংশে প্রশ্নগুলো দ্রষ্টব্য। — সম্পাদক।

[৩] দেখুন: সীরাতু ইবনে হিশাম, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৯ এবং তারিখু ইবনে কাছীর, ৩য় খণ্ড, পৃ. ২৪৬ - ২৪৭

[৪] দেখুন: নসবুর রায়াত (نصب الراية), ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩৮১

[৫] আহলে কিতাব তথা কিতাবের অনুসারী ইয়াহূদী ও খৃষ্টান ধর্মানুবর্তী মহিলা। —অনুবাদক।

[৬] আল-‘আলাকাতুদ দাউলিয়া লি কামিলিদ্ দাকস (العلاقات الدولية لكامل الدقس), পৃ. ৩৩৩

[৭] দেখুন: জোসতাফ লুবুন, হাদারাতুল ‘আরব (حضارة العرب), পৃ. ২৭৯

[৮] দেখুন: আবদুর রহমান আল-ময়দানী, মাকায়িদু ইয়াহুদীয়া ‘আবরাত্ তারীখ (مكايد يهودية عبر التاريخ), পৃ. ৪৪৬ এবং তৎপরবর্তী পৃষ্ঠা, যা জাওয়াদ রাফাত কর্তৃক প্রকাশিত তার ইসলাম ও বনু ইসরাঈল (الإسلام و بنو إسرائيل) নামক গ্রন্থের ‘ঐতিহাসিক ইহুদী চুক্তিপত্র’ থেকে উদ্ধৃত।

[৯] বদর মদীনার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম।

[১০] ‘রবযা’ মদীনার নিকটবর্তী একটি গ্রামের নাম।

[১১] এ ছাড়াও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাসদাসী স্বাধীন করার সওয়াব বর্ণনা করে আরও বলেন: “যে কেউ কোন দাস বা দাসী স্বাধীন করবে, আল্লাহ্ তাকে তার প্রতিটি অঙ্গের বিনিময়ে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করবেন।” [বুখারী ও মুসলিম]

কুরআনুল কারীমেও জাহান্নাম থেকে মুক্তির জন্য দাসমুক্তিকে অন্যতম মাধ্যম হিসেবে ঘোষণা করে বলা হয়েছে: “তবে সে তো বন্ধুর গিরিপথে প্রবেশ করেনি। আর কিসে আপনাকে জানাবে— বন্ধুর গিরিপথ কী?

এটা হচ্ছে: দাসমুক্তি...” [সূরা আল-বালাদ: ১১-১৩] — সম্পাদক।

[১২] হাম হল কেনানের পিতা।

[১৩] অর্থাৎ পাশ্চাত্যে নারীদের উন্নতি!র বিষয়টি বলা হয়ে থাকে, তা ইয়াহূদী বা খ্রিষ্টানদের সৃষ্ট নয়; সেটি মূলত: ইয়াহূদী ও খ্রিষ্টানদের শিক্ষাকে পাশ কাটিয়ে সৃষ্ট হয়েছে। আর যাতে রয়েছে অনেক বিপর্যয়; যদিও বাহ্যিকভাবে তা অনেককেই চমৎকৃত করে।

[১৪] অর্থাৎ নারীদের ব্যাপারে কে·ানটি আমাদের কাছে মডেল হবে, ইয়াহূদী, খ্রিষ্টানদের কথা, নাকি

পাশ্চাত্য সভ্যতা, নাকি অন্য কিছু, যা দেখে বা যার দিকে আমরা আমাদের নারী-সমাজকে নিয়ে যাব? –সম্পাদক।

[১৫] আনিস মানসুর, সহীফাতুল আহরাম (صحيفة الأهرام), ১৩/ ৯/ ১৯৭৯ খৃ.